ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো ‘পরে

The Ahmadi Fortnightly

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৭৫ বর্ষ | ৯ম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ০১ অগ্রহায়ণ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ | ২৯ জিলহজ্জ, ১৪৩৩ হিজরি | ১৫ নবুওয়ত, ১৩৯১ হি. শা. | ১৫ নভেম্বর, ২০১২ ঈসাব্দ

রংপুর জেলার তারাগঞ্জ থানাধীন মেনানগরে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক নির্মিত মসজিদ। পুনর্নির্মাণের সময় গত ৭ নভেম্বর, ২০১২-তে কতিপয় ধর্মীয় উগ্রপন্থীর ইন্ধনে ধর্মান্ধ কিছু লোক অগ্নিসংযোগ করে ও তান্ডব চালিয়ে নিরীহ আহমদীদের এই মসজিদটিকে শহীদ করে।
এই ছবিটি ২০০৮ সালে তোলা।

সাদ
সত্যের সন্ধানে
A New Live Bangla Discussion Programme

আবারও সত্যের সন্ধানে
২৯ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বর টানা ৪ দিন ব্যাপী
এখন থেকেই প্রস্তুতি নিন...

Luxury Forever...

Bashundhara
Size : 1285-1750 sft

Dhanmondi
Size : 1350 sft

Zigatola
Size : 1285 sft

Nurer Chala
Size : 1210-1215 sft

Mirpur
Size : 1275-1350 sft

Nordha
Size : 1165-1350 sft

Land Wanted

Hot Line : 01817-033388, 01819-296797, 01817-143100

কৌণিক প্রপার্টিজ লিঃ

Member | REHAB

Kounik Properties Ltd

Corporate Office : Safwan Road, House # 193, Level # 6, Block # B, Bashundhara, Baridhara, Dhaka-1229, Bangladesh.

LOVE FOR ALL, HATRED FOR NONE

veronica tours & travels

Muhammad Belal Ahmad (Tushar)
ceo

Travel Agent & Tour Operator

VERONICA TOURS & TRAVELS
207/2, West Kafrul, Begum Rokeya Swarani, Mirpur, Dhaka-1207
Phone: 88 02 9113176, Cell: 01733 004412, 01552 403395, E-mail: veronica@ithbd.com, tusharith@gmail.com

Our Sister Concern:
International Trading House (Garments Accessories Supplier),Hafsa Fashion Ltd. (Readymade Garments Manufacturer)
Awl Fashion (Buying Office), Color Clouds (Arts & Craft House), Bakers Bay (Bakery & Sweets)

Amecon Since 1983

www.amecon-bd.net

Our Activities
- Crest
- Trophy
- Sign Board
- Metal Sign
- Acrylic Letter
- POP & Interior
- Digital Printing

MEMBER ARA

H-79/3, Block-E, Chairman Bari, Banani, Dhaka-1213
Tel: 8824945, 9895686, 03792003208, Fax: 880-2-8824945
E-mail: amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com

AMECON NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola	Kanas Gari, Sherpur Road	205, Baizid Bostami Road
Jessore. Tel : 67284	Bogra. Tel : 73315	Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

সম্পাদকীয়

মহানবী (সা.)-এর অবমাননার প্রতিকারে মুসলিম বিশ্বের জন্য দিকদর্শী নির্দেশনা

বিশ্বের এক বিশাল অঞ্চলজুড়ে মুসলমান সরকার ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীর একটি বড় অংশ মুসলমানদের অধিনস্ত। অনেক মুসলমান রাষ্ট্রকে আল্লাহ্ তা'লা প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ করেছেন। মুসলমান দেশগুলো জাতিসংঘেরও সদস্য। পবিত্র কুরআন একটি পূর্ণাঙ্গীন জীবন বিধান– এর অনুসারীরা ও এর অধ্যয়নকারীরাও পৃথিবীতে বিদ্যমান। তা সত্ত্বেও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কেন এর অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষামালাকে জগতের সামনে তুলে ধরতে মুসলমান রাষ্ট্রগুলো চেষ্টা করে নি বা এখনও কেন উদ্যোগ নিচ্ছে না।

পবিত্র কুরআনের শিক্ষানুসারে তারা কেন জগতদ্বাসীকে একথা বলছে না, ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতি নিয়ে ছিনিমিনি খেলা আর আল্লাহ্‌র নবীদের অসম্মান করা কিংবা এ উদ্দেশ্যে অপচেষ্টা করা– এ সবই অপরাধ, জঘন্য অপরাধ ও পাপ বিশেষ! আর বিশ্বশান্তির জন্য এ কথাটি জাতিসংঘের শান্তি ঘোষণায় সন্নিবেশিত করা আবশ্যক : **"কোন সদস্য দেশ তার নাগরিকদেরকে ভিনধর্মীদের অনুভূতি নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অনুমতি দিবে না। চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নামে বিশ্বের শান্তি বিনষ্ট করার অনুমতি দেয়া যাবে না।"**

বড়ই আক্ষেপ! এতদিন ধরে এতকিছু ঘটছে তথাপি মহানবী (সা.) এবং বিশ্বের সকল নবী-রসূলের সম্মান ও মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার ব্যাপারে জগদ্বাসীকে অবহিত করার জন্য এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এ বিষয়ে স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোর পক্ষ থেকে সম্মিলিতভাবে কোন বস্তুনিষ্ঠ পদক্ষেপ নেয়া হয় নি। যদিও জাতিসংঘের অন্যান্য সিদ্ধান্ত, যেমন মানবাধিকার ঘোষণার মত, এটিও কার্যকর হবে না, কিন্তু কমপক্ষে বিষয়টি রেকর্ডভুক্ত হয়ে যাবে। ওআইসি অর্থাৎ অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কোঅপারেশন নামক একটি প্রতিষ্ঠানের যদিও অস্তিত্ব আছে কিন্তু এর মাধ্যমে কখনো এমন কোন বস্তুনিষ্ঠ পদক্ষেপ নেয়া হয় নি যার মাধ্যমে জগতে মুসলমানদের অবস্থান সুদৃঢ় হয়।

মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোর রাজনীতিবিদরা নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য সব ধরনের চেষ্টা-প্রচেষ্টায় রত, কিন্তু ধর্মের মাহাত্ম্য ও মর্যাদা রক্ষার বিষয়টি তাদের মাথায় থাকে না। আমাদের নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে যদি বস্তুনিষ্ঠ পদক্ষেপ নেয়া হতো তাহলে জনসাধারণের পক্ষ থেকে এসব ভুল প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হতো না যা দৃষ্টান্তস্বরূপ, আজ পাকিস্তান বা অন্যান্য দেশে হচ্ছে।

তারা এ কথা ভেবে নিশ্চিত থাকতে পারতো, আমাদের নেতৃত্ব এ কাজে নিয়োজিত আর তারা নিজেদের দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট। এরা মহানবী (সা.)-এর সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বরং সমস্ত নবী-রসূলের সম্মান প্রতিষ্ঠায় এমনভাবে আন্তর্জাতিক ফোরামে নিজেদের দৃঢ় অবস্থান প্রদর্শন করবেন যার কারণে জগদ্বাসীকে তাদের কথা সত্য ও যথার্থ বলে মানতে হবে।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ৫ম খলীফা

mwPc Î

১৫ নভেম্বর ২০১২

কুরআন শরীফ	২
হাদীস শরীফ	৩
অমৃত বাণী	৪
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) প্রদত্ত **জুমুআর খুতবা** (১৯ অক্টোবর ২০১২)	৫
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) প্রদত্ত **জুমুআর খুতবা** (১২ অক্টোবর ২০১২)	১৩
ঋণ সম্পর্কিত ইসলামী শিক্ষা – আলহাজ্জ মাওলানা সালেহ্ আহমদ, শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ	২১
শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) – মাহমুদ আহমদ সুমন	২৪
প্রথম বাঙালি শহীদ মোহাম্মদ ওসমান গনি – মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল	২৬
হিফজুল কুরআন কাস শুরু ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা – কৃষিবিদ - মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী	২৮
সত্যের সন্ধানে	৩০
পত্র-পত্রিকার পাতা থেকে	৩১
সংবাদ	৩৩
বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী	৩৪
এমটিএ, বাংলাদেশ স্টুডিও	৩৫

কুরআন শরীফ

সূরা আর্ রা'দ-১৩

وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ
قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى ؕ بَلْ لِّلّٰهِ
الْاَمْرُ جَمِيْعًا ؕ اَفَلَمْ يَايْـَٔسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ لَّوْ
يَشَآءُ اللّٰهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَلَا يَزَالُ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ
قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتّٰى يَاْتِيَ وَعْدُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا
يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿۳۲﴾

৩২। আর কুরআন যদি এমনই হতো, যা দিয়ে পাহাড় পর্বত[১৪৪১] স্থানচ্যুত করা যেত অথবা যা দিয়ে পৃথিবীকে খন্ডবিখন্ড[১৪৪২] করে দেয়া যেত কিংবা যার মাধ্যমে মৃতদের সাথে কথা[১৪৪৩] বলা যেত (তবুও তারা সন্দেহেই পড়ে থাকতো)। প্রকৃতপক্ষে সব সিদ্ধান্ত পুরোপুরি আল্লাহ্‌রই (হাতে)। অতএব, যারা ঈমান এনেছে, তারা কি অবগত নয়, আল্লাহ্ যদি চাইতেন, তিনি সব মানুষকে হেদায়াত দিয়ে দিতেন? আর যারা অস্বীকার করেছে, আল্লাহ্‌র (চূড়ান্ত) প্রতিশ্রুতি পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাদের কৃতকর্মের দরুন তাদের ওপর (হৃদয়ে আঘাতকারী) কোন না কোন ভয়ঙ্কর আযাব আসতে থাকবে অথবা (এ আযাব) তাদের বাড়ীঘরের ধারে কাছে[১৪৪৪] নেমে আসতে থাকবে। আল্লাহ্ নিশ্চয় প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না।*

১৪৪১। জাবাল (পাহাড়) বহুবচনে জিবাল, যার আলঙ্কারিক অর্থ ঃ গোত্র বা গোষ্ঠীর নেতা, (২) সমসাময়িক লোকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বান ব্যক্তি, (৩) ভীষণ দুঃখ, কেশ, দুর্যোগ (আকরাব)। এখানে তফসীরাধীন বাক্যাংশের অর্থ হতে পারে, সকল কঠিন সমস্যা, মানুষকে যেগুলোর সম্মুখীন হতে হয়, কুরআন করীম তার সমাধান দেয়। এও হতে পারে, এটি (কুরআন) সব পুরনো নিয়মাবলী রদ করেছে এবং নানা প্রকার মানবিক সমস্যা সমাধানে নতুন পথ উন্মুক্ত করেছে।

১৪৪২। এই বাক্যের অর্থ হলো কুরআন দ্রুতগতিতে সারা দুনিয়াতে বিস্তার লাভ করবে। শাব্দিক অর্থে শত্রুর এলাকা হতে ভুখন্ড কর্তন (বিচ্ছিন্ন) করে বিশ্বাসীর দখলে অর্পণ করা হবে।

১৪৪৩। আধ্যাত্মিকভাবে মৃত ব্যক্তিদেরকে কুরআনের সাহায্যে কেবল শীঘ্র নতুন জীবন দান করা হবে না, দেখতে দেখতে তারা তত্ত্বপূর্ণ জ্ঞানের কথাও বলবে এবং সারা পৃথিবীতে কুরআনের বাণী প্রচার করবে।

১৪৪৪। অবিশ্বাসীদের ওপর বিপদের পর বিপদ নেমে আসতে থাকবে এবং একের পর এক বিপর্যয় তাদের উপর নেমে আসতে থাকবে, যে পর্যন্ত না তাদের দুর্গতুল্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল প্রধান নগরী মক্কার পতনের মাধ্যমে তাদের শক্তি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হবে।

*[কুরআন করীম তেলাওয়াত করলে পাহাড় স্থানচ্যুত হয় না, পৃথিবীও খন্ডবিখন্ড হয় না এবং মৃতদের সাথেও কথা বলা যায় না। বরং এসব কিছুই আল্লাহ্‌র আদেশেই ঘটতে পারে। এতে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ.) এর আদেশে পাহাড় স্থানচ্যুত হতো না, পৃথিবী খন্ডবিখন্ড হতো না এবং মৃতরাও জীবিত হতো না। বরং এসব আল্লাহ্‌র আদেশেই কার্যকর হতো।

[হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে.) কর্তৃক উর্দূতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য]

হাদীস শরীফ

অহংকারীকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না

কুরআন :

এবং ভূ-পৃষ্ঠে অহংকারের সাথে চলাফেরা করো না, কোন দাম্ভিক অহংকারীকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না (সূরা লোকমান : ১৯)।

হাদীস :

কেউ অন্যের কর্তৃত্বের স্থানে গিয়ে যেন ইমামতী না করে এবং কারো বাসায় গিয়ে (সৃহ মালিকের) বসার স্থানে অনুমতি ব্যতিরেকে না বসে (তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা :

ইসলাম জীবনের উন্নততর বিকাশ চায়। এমন একটি সমাজ গড়ে তুলতে চায়, যেখানে মানবতার বিকাশের সাথে সাথে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির উত্তম সম্পর্ক গড়ে উঠবে। উন্নতির পথে সহায়ক এমন প্রতিটি বিষয়-বস্তুকে ইসলাম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করেছে। মানবতার বিকাশের জন্য বিনয়ী হওয়া আবশ্যকীয়। বিনয়ই জন মানূষের মাঝে প্রেম, ভালোবাসা ও সহানুভূতির জন্ম দেয়। তাই পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, তোমার চলাফেরার মাঝে যেন অহংকারের ছাপ না থাকে। কেননা, আল্লাহ্ অহংকারকে পসন্দ করেন না। সাধারণত যে অহংকারী, সে কখনও বলে না যে, আমি অহংকারী। অহংকারীর পরিচয় তার আমলে।

শুধু যে জাগতিক বিষয়েই মানুষ অহংকারী হয়, তা নয়। বরং আধ্যাত্মিক ব্যাপারেও মানুষ অহংকারী হয়, যা অত্যন্ত ভয়াবহ। অহংকার মানুষকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিপতিত করে। হযরত নবী করীম (সা.) তাঁর মহামূল্যবান বাণীতে অহংকারের দু'টি চিহ্ন বর্ণনা করেছেন। প্রথমত একজন যত বড় আলেমই হোক না কেন, তিনি যেন কোথাও গমন করে স্থানীয় ইমামের অনুমতি ব্যতিরেকে ইমামতী না করেন। হ্যাঁ, এমন ব্যক্তি, যে খিলাফতের ব্যবস্থাপনায় সর্বস্থানে ইমাম হবার যোগ্যতা রাখে, তার ব্যাপার অন্য। নবী করীম (সা.) আরেকটি চিহ্ন বর্ণনা করেছেন যে, কারও বাসায় গেলে গৃহকর্তার আসনে যেন তার অনুমতি ব্যতিরেকে কেউ না বসে। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখলে ব্যাপারটি অতি গুরুতর। এরূপ স্থানেই মানুষের ব্যক্তিত্ববোধ জাগ্রত হয়। আর সেটাই হলো মানুষের জন্য বিনয় প্রকাশের উত্তম স্থান।

আল্লাহ্ করুন আমরা যেন বিনয়ের পথ অনুসরণের মাধ্যমে খোদার নৈকট্য লাভ করি। আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ আহমদ

মুরব্বী সিলসিলাহ

"এবং ভূ-পৃষ্ঠে অহংকারের সাথে চলাফেরা করো না, কোন দাম্ভিক অহংকারীকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না"

(সূরা লোকমান : ১৯)

অমৃতবাণী

হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) হলেন খাতামান নবীঈন

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

'আমাদের নেতা ও প্রভু আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি খোদা তা'লার তরফ থেকে যে সকল নিদর্শন ও মোজেজা প্রকাশিত হয়েছিল, তা কেবল সেই যুগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং, তার ধারাবাহিকতা কেয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে। অতীতে যে নবীরা এসেছিলেন, তাঁরা কেউই তাঁদের পূর্ববর্তী নবীর উম্মতরূপে নিজেকে গণ্য করতেন না, এবং নিজেকে উম্মতি বলে প্রচারও করতেন না। যদিও তাঁরা পূর্ববর্তী নবীর ধর্মেরই সাহায্য করতেন এবং তাঁদেরকে সত্য বলে জানতেন। কিন্তু, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বিশেষ এই গৌরব দান করা হয়েছিল যে, তিনি-খাতামান নবীঈন। এর এক অর্থ হচ্ছে, নবুওয়তের সমস্ত পূর্ণতা, উৎকর্ষতা বা কামালাত তাঁর ওপরে খতম হয়ে গেছে; এবং দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে,- তাঁর (সা.) পরে আর নতুন শরীয়তওয়ালা কোন রাসূল নেই; এবং তার (সা.) পরে এমন কোন নবী নেই, যিনি তাঁর উম্মত-বহির্ভূত। বরং, এমন প্রত্যেক ব্যক্তি, যিনি খোদা তাআলার সহিত বাক্যালাপের সম্মানে সম্মানিত, তিনি সেই সম্মান লাভ করেন একমাত্র তাঁরই (সা.) কল্যাণে এবং তাঁরই মধ্যস্থতায়; তিনি উম্মতি, তিনি মুস্তাকিম বা সরাসরি নবী নন। তাঁকে (সা.) এতো উচ্চ মর্যাদা দিয়ে কবুল করা হয়েছে যে, আজ অন্তত:পক্ষে বিভিন্ন শ্রেণীর বিশ কোটি মুসলমান তাঁর গোলামী করার জন্য কোমর বেঁধে দন্ডায়মান আছে। এবং যখন থেকে খোদা তাঁকে সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকেই বড় বড় শক্তিশালী সম্রাটগণ, যারা দিগ্বজয়ী ছিলেন, তাঁরাও তাঁর (সা.) পদতলে নিজেদেরকে সামান্য ভৃত্যের ন্যায় উৎসর্গ করেছিলেন। এবং বর্তমান কালেও মুসলিম বাদশাহগণ তাঁর সামনে নিজেদেরকে নগণ্য চাকরের মতই মনে করেন, এবং তাঁর (সা.) নাম উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সিংহাসন থেকে নেমে আসেন।

অতএব, এটা বিবেচনা করে দেখার বিষয় যে, এই যে মান-ইজ্জত, এই যে শওকত ও ঐশ্বর্য্য, এই যে সৌভাগ্য, এই যে জালাল বা গৌরব ও প্রতাপ, এবং এই যে হাজারো আসমানী-নিদর্শন, এই হাজারো ঐশী-আশিস ও কল্যাণ, তা কি কোন মিথ্যাবাদী লাভ করতে পারে? আমরা বড়ই গৌরবান্বিত যে, যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আঁচল আমরা আঁকড়ে ধরেছি তাঁর ওপরে খোদা তাআলার কৃপা-কল্যাণের কোন সীমা নেই, অন্ত নেই। তিনি খোদা তো নন ঠিকই, কিন্তু তাঁরই মাধ্যমে আমরা খোদাকে দেখেছি। তাঁর ধর্ম, যা আমরা পেয়েছি, তা খোদার ক্ষমতাসমূহের আয়না। যদি ইসলাম না হতো, তাহলে এই যুগে এটা বুঝানোই সম্ভব ছিল না যে, নবুওয়াত কি জিনিষ। এছাড়া, মোজেজা সম্ভব কি না, এবং তা প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর আওতাভুক্ত কি না, এসব কিছুর সমাধান হয়ে গেছে সেই নবীর (সা.) চিরস্থায়ী কল্যাণ দ্বারা। এবং তাঁরই বদৌলতে আজ আমরা অন্যান্য জাতির মত কেবল কেচ্ছা-কাহিনীর কথক নই, বরং আমাদের সাথে রয়েছে খোদার নূর এবং খোদার আসমানী সাহায্য। আমরা কি বস্তু যে, আমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা করি! যে খোদা অন্য সকলের কাছে গোপন, যাঁর গোপন-শক্তি অন্য সবার ধারণার অতীত, সেই মহাগৌরব ও প্রতাপের অধিকারী খোদা শুধু এই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কারণেই আমাদের ওপরে প্রকাশিত হয়েছে।' (সংযুক্ত প্রবন্ধ : চশমা মারেফাত, পৃ ৮-১০)

জুমুআর খুতবা

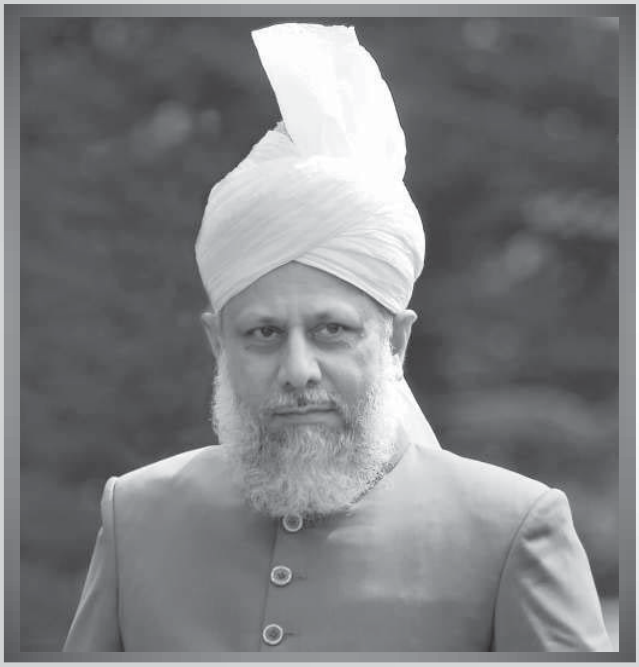

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ১৯ অক্টোবর ২০১২-এর (১৯ তাবূক, ১৩৯১ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

আজ আবারো আমি আপনাদের হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সম্মানিত সাহাবীদের বৈঠক বা অধিবেশনে নিয়ে যাব। আমি তাঁদের বর্ণিত বা তাদের সম্পর্কিত ঘটনা বা রেওয়ায়াত বর্ণনা করছি। এসব রেওয়ায়েত বা ঘটনা তাঁদের ঈমান এবং মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বৈঠকের বিস্ময়কর চিত্র তুলে ধরে।

সৈয়দ হুসেইন আলী শাহ্ সাহেবের ছেলে হযরত বেলায়াত আলী শাহ্ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেছেন, 'হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দেখার সুযোগ আমার কমই হয়েছে। কারণ আমি এমন একটি চাকরী করতাম যাতে ছুটি-ছাটা খুব কমই দেয়া হত। আমি স্বপ্ন দেখে বয়আত করেছিলাম। মাতুপুরের হেডওয়ার্কসে আমি নিয়োগ প্রাপ্ত ছিলাম, যার পাশ দিয়ে হেড বারীর দোআব নদী প্রবাহিত হয়। স্বপ্নটি হল, সরকারী কোয়ার্টারের আঙ্গিনায় আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। খুব সুন্দর ভঙ্গিতে চলনরত একদল আকর্ষণীয় মানুষ, সরকারী কোয়ার্টারের সামনে দিয়ে পায়ে হেঁটে আমার কোয়ার্টারের ছাদে উঠে যায়। তাদের সামনে ছিলেন সুদর্শন ও চমৎকার পোশাক পরিহিত একজন সম্মানিত মানুষ, যার মাথায় এমন উজ্জল মুকুট ছিল যে, সেদিকে তাকানো যাচ্ছিল না। (মিছিলের মত একটি দল যাচ্ছিল, তাদের নেতৃত্বে ছিলেন একজন সম্মানিত বুযুর্গ, তারা দেয়ালের উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন)। সেখানে বিউগলের মাধ্যমে আযান দেয়া হয়, যার ধ্বনি অনেক দূর-দূরান্ত পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হয়। তারপর মনে হল, তারা নামায পড়ছেন। তারা সেই দেয়ালের উপর দিয়েই ফিরে যান। তিনি বলেন, তারা যখন আমার বিছানার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন আমাকে সম্বোধন করে বললেন, ভাই! 'ভেতর থেকে পায়খানা বের করে দাও।' অর্থাৎ নিজের অবিত্রতা ও নোংরামী বের করে দাও। আমি স্বপ্নের মধ্যেই বললাম, আচ্ছা! ঠিক আছে। তারা যখন বাহিরে চলে যায় তখন আমি তাদের পেছনের জনকে বললাম, 'এই বুযূর্গ কে'? তাদের একজন বললেন, 'আপনি জানেন না? ইনি হযরত মির্যা সাহেব।'

এরপর ফজরের সময় আমার বন্ধু মরহুম ডাঃ মুহাম্মদ ইসমাঈল খাঁন সাহেব আমার দরজায় কড়া নাড়লেন। আমি বাহিরে এলে তিনি বলেন, 'শাহ্ সাহেব! আপনি তো আহমদী হয়ে গেছেন।

আমি বললাম, কীভাবে? তিনি বললেন, 'আজ রাতে আমি স্বপ্নে দেখি, আপনি চিকিৎসালয়ে এসে বসেছেন তারপর আমি ভেতরে গিয়ে আমার সিন্দুক খুলে খুব সুন্দর একটি গাউন বের করে আপনাকে পরিয়ে দেই। আপনার গায়ে সেটি খুব সুন্দর মানিয়েছে। তারপর আমি খুব সুন্দর সুন্দর বোতাম এনে সেই গাউনে লাগিয়ে দেই।

শুধু তিনিই স্বপ্ন দেখেন নি বরং তাঁর আহমদী বন্ধুকেও আল্লাহ্ তা'লা স্বপ্নে ইঙ্গিতে জানিয়ে দেন, তিনি আহমদীয়াতের প্রতি আকৃষ্ট বা আহমদী হয়ে যাবেন কেননা, তিনি সৎ প্রকৃতির ছিলেন।

যাহোক, তিনি লিখেন, কিছুদিন পর, আমি আমার শ্বশুরালয়ে অর্থাৎ মরহুম সৈয়দ আকবর শাহ্ সাহেবের বাড়ি যাই। তখন তার প্রতিবেশী মরহুম মির্যা গোলাম উল্লাহ্ সাহেব, আমার কাছে আসেন। সেদিন শুক্রবার ছিল, আমি তার সাথে মসজিদে আকসায় গেলাম। তিনি আমাকে মিম্বরের কাছে বসিয়ে দেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এলে তিনি হযরত আকদাস (আ.)-এর সমীপে আমার বয়আতের আবেদন জানান। হুযূর (আ.) পরম স্নেহের সঙ্গে আমার হাতটি নিজ হাতে তুলে নেন, আর অন্য বয়আতকারীরা আমার পিঠের উপর হাত রেখে বয়আত করেন।

হযরত এনায়েত উল্লাহ্ সাহেব (রা.) নিজের বয়আতের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেন, 'আমি ১৯০১ সালে বয়আত করেছি। তখন আমার বয়স ছিল প্রায় ১৫ বছর। প্রথমবার যখন আমি কাদিয়ান যাই, সাথে করে এক শিশি আতর নিয়ে গিয়েছিলাম। পদব্রজে সফর করছিলাম। রাতে বাটালায় অবস্থান করি। যখন দেখলাম তখন শিশিটিতে এক ফোঁটা আতর ছাড়া পুরোটাই পড়ে গিয়েছিল। আমার খুব দুঃখ হল। মাগরিবের নামাযের সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন মসজিদে মোবারকের ছাদে এলেন, তখন আমি করমর্দন করলাম এবং হুযূরের পা টিপে দিতে শুরু করলাম। পরে বললাম, আমি এক শিশি আতর এনেছিলাম, কিন্তু রাস্তায় পড়ে গেছে। আমি হুযূর (আ.)-কে শিশিটি দিলাম। হুযূর (আ.) বললেন, 'তুমি পুরো শিশি'র পুণ্যই পেয়েছো।' হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) শিশিতে অবশিষ্ট এক ফোঁটা বা তারও কম যে আতর ছিল তা-ই গ্রহণ করেন এবং বলেন, তোমার উপহার দেয়ার বাসনা ছিল, কাজেই তুমি পুরো শিশি'র সোয়াব-ই পেয়েছ। তিনি বলেন, নামাযের পরে বয়আত করি এবং দশ দিন অবস্থান করি।

তিনি আরো লিখেন, 'একবারকার কথা, কাদিয়ান থেকে ফেরার পথে বাটালা পৌঁছি। একজন জমিদার বা ভূস্বামীও আমার সাথে ছিলেন। রাতে বাটালা অবস্থান করি। তিনি জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি হুযূর (আ.)-এর অনুমতি নিয়েছেন? আমি বললাম, না। অনুমতি না নিয়ে আসাতে আমার দুঃখ হল। রাতে স্বপ্নে দেখি, হুযূর (আ.) চৌকিতে বসে রুটি খাচ্ছেন এবং আমাকেও খেতে বলছেন। হুযূর (আ.) অর্ধেক রুটি খেলেন আর বাকী অর্ধেক আমি খেলাম। হুযূর (আ.) বললেন, যাও তোমাকে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হল।' তিনি লিখেন, আমি নিরক্ষর ছিলাম আর তোতলামিও ছিল। হুযূর (আ.)-এর সুদৃষ্টি ও দোয়ার কল্যাণে এখন আমি পুরোপুরি সুস্থ্য।

শেখ আতাউল্লাহ্ সাহেব বর্ণনা করেন, গোল কামরার কাছে যেখানে বাবু ফখরুদ্দীন মুলতানীর দোকান ছিল সেখানে একদিন আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। এমন সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মসজিদে মুবারকের দরজায় এসে আমাকে ডেকে বললেন, মিয়া আতাউল্লাহ্! এ চিঠিটি বাক্সে ফেলে আস। এ কথা শুনে আমি খুব আনন্দিত হলাম, কেননা হুযূর (আ.) আমার নাম মনে রেখেছেন। প্রতিদিন মাগরিবের সময় হুযূর (আ.) সাধারণত এক গ্লাস ছাগলের কাঁচা দুধ পান করতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে এক ব্যক্তি আবেদন করে বলল, হুযূর! কাঁচা দুধ পান করবেন না। এ কথা শুনে হুযূর (আ.) বললেন, অধিকাংশ নবী আলাইহিমুস সালাম কাঁচা দুধই পান করতেন। কিছুদিন পর আমার প্রচন্ড জ্বর হল, তাপমাত্রা খুব বেশি, যক্ষার চেয়েও কঠিন অসুখ হল। আমি তখন টেলিগ্রাফ অফিসে কর্মরত ছিলাম। আমি ছুটি নিয়ে কাদিয়ান চলে গেলাম। হযরত মৌলভী নূর উদ্দীন খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর বাড়িতে উঠলাম। কেননা জম্মুতে আমি তাঁর মাধ্যমেই ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করি। এই আধ্যাত্মিক সম্পর্ক ও আন্তরিকতার কারণে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) আমার চিকিৎসা শুরু করেন। ভোরবেলা তিনি খিচুড়ী এবং একটি সিদ্ধ ডিম খাওয়ানোর পর আমাকে ঔষধ দিতেন। এসব জিনিস খেয়ে খেয়ে আমার মুখের রুচি একেবারেই নষ্ট হয়ে যায় কেননা, আমার এসব খাওয়ার অভ্যাস ছিল না। তিনি বলেন, একদিন সন্ধ্যায় আব্দুস সালাম সাহেবের শ্রদ্ধেয়া আম্মাজান {অর্থাৎ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর স্ত্রী}-র কাছে নিবেদন করলাম, আমার মুখের রুচি নষ্ট গেছে, একটু ঝোল বা অন্য কোন নোন্‌তা খাবার খেলে রুচি ফিরে পেতাম। তিনি বললেন, মৌলভী সাহেব রাগ করবেন। তথাপি একটি কাপড় দিয়ে মরিচ ছেকে ও পরিষ্কার করে তিনি আমাকে (ঝোল) পান করান। অর্থাৎ তরকারীর সাধারণ ঝোল ছেকে পান করিয়েছেন। পরদিন সকালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) আমার নাড়ী দেখে বললেন, রাতে তুমি কী খাবার খেয়েছ? (ডাক্তাররা এখন বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরও বুঝতে পারে না, অথচ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) নাড়ী দেখেই বললেন, রাতে তুমি কী খেয়েছ? নাড়ী খুব দ্রুত স্পন্দিত হচ্ছিল)। আমি বললাম, কিছুই না। তিনি (রা.) দরস শেষ করে তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, আতাউল্লাহ্ রাতে কী খেয়েছে? তিনি বললেন, খাবার খাওয়ার পর সে জোরাজুরি করে একটু ঝোল খেয়েছে, এতে তিনি তাঁর প্রতি এবং আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। আর আমাকে বলেন, তুমি এতো বড় মিথ্যা কথা বলেছ! তিনি বলেন, যাহোক, হযরত মৌলভী সাহেব আমার মিথ্যা বলা ও নিষিদ্ধ খাবার খাওয়ার ঘটনা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে উল্লেখ করে বলেন, সে তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন নয়। সে যক্ষা রোগে আক্রান্ত অর্থাৎ টি.বি রোগে আক্রান্ত। অসুখের কারণে আমি খুবই দুর্বল হয়ে গিয়েছিলাম। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ও এ কথা শুনে খুব অসন্তুষ্ট হন। তিনি বলেন, অবশেষে আমার দু'মাসের ছুটি ফুরিয়ে গেল। হযরত মৌলভী সাহেব আমার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে খুবই চিন্তিত ছিলেন। সেবনের জন্য ঔষধ ইত্যাদি বানিয়ে আমার সাথে দিয়ে দিলেন, এবং বললেন, আমি দোয়াও করব। হুযূর (আ.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে আবেদন করলাম, হুযূর! ছুটি শেষ তাই আজ আমি

রাওয়ালপিন্ডি ফিরে যাচ্ছি। স্বাস্থ্য ভাল না, দোয়া করবেন। হুযূর (আ.) দোয়া করলেন এবং বললেন, নামাযে তুমি একান্ত বিনয়, নম্রতা ও আন্তরিকতার সাথে দোয়া করবে, কাদিয়ানে চিঠি পত্র লিখতে থাকবে এবং বারবার আসবে। এরপর বললেন, বর্জনীয় খাবার পরিত্যাগ করবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর স্মরণ ছিল, তার নিষিদ্ধ খাবার খাওয়ার অভ্যাস আছে, তাই তিনি বলেছেন, বর্জনীয় খাবার ছাড়তে হবে। আল্লাহ্‌র দরবারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কর, আল্লাহ্ তা'লা পরম ক্ষমাশীল, নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে আরোগ্য দান করবেন। তিনি বলেন, আমি রাত প্রায় দেড়টার সময় রাওয়ালপিন্ডি পৌঁছি। রাতে এ অধম অজানা ভাষায় একটি স্বপ্ন দেখে, যার কিছুই বোধগম্য হলো না। বিস্মিত হলাম, আল্লাহ্ তা'লার দরবারে লুটিয়ে পড়ে নিবেদন করলাম, হে খোদা! তোমার সত্তা সকল ভাষা সম্বন্ধে অবগত, তুমি আমাকে এ স্বপ্নের অর্থ বুঝিয়ে দাও। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বিশেষ অনুগ্রহবশে রাত আড়াইটার দিকে আমার মুখ থেকে যা নিসৃত করালেন তাহল, সুস্থ, সুস্থ, সুস্থ। শব্দের পুনরাবৃত্তি আমাকে জাগ্রত করল, অর্থাৎ তুমি সুস্থ হয়ে গেছ। তিনি বলেন, আজ অবধি প্রায় বিশ বছর হতে চলল, আর কখনো আমার মাথা ব্যাথাও হয় নি। এছাড়া সব বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লার এমন কৃপা হয় যে, সন্তান জন্ম নেয়া শুরু করে। আগে তার সন্তান ছিল না। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এরপর তার তিন ছেলে ও চার মেয়ে সন্তান জন্ম নেয়।

আরেকজন সাহাবী হলেন হযরত মালেক নিয়ায সাহেব (রা.)-এর ছেলে হযরত মালেক বরকত উল্লাহ্ সাহেব (রা.)। তিনি বলেন, যদিও আমার পিতা মালেক বরকত আলী সাহেব ১৮৯৭ বা ৯৮ সাল থেকে আহমদী ছিলেন এবং আমিও তার অনুসরণে বাল্যকাল থেকেই আহমদী ছিলাম তথাপি ১৯০৪ সালে যখন আমার বয়স প্রায় চৌদ্দ বছর তখন আমি স্বয়ং হুযূর (আ.)-এর হাতে বয়আত করি। বয়আতের পর হুযূর (আ.) যে দোয়া করতেন তার ভাগী হওয়ার জন্য কেউ নতুন কেউ বয়আত করলে আমিও বয়আত করতাম। অনেক সময় বয়আতকারীদের সংখ্যা অনেক হতো। তারা নিজ নিজ পাগড়ী খুলে হুযূরের হাতে দিতেন এবং অন্য সবাই সেই পাগড়ী ধরত, আর এভাবে সবার বয়আত হয়ে যেত।

হযরত ডাক্তার উমর দ্বীন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, আমি ১৮৭৯ সালের ২৮ জুলাই জন্ম গ্রহণ করি, ১৯০৫ সালের ৩০ জুন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করি এবং ১৯২৮ সালের ২৩ জুলাই ওসীয়্যত করি। তিনি তাঁর ওসীয়্যত নম্বরও লিখেন, ২৮৯৮। তিনি বলেন, ১৯২৪ সালের অক্টোবর মাস থেকে দু'বছর পর্যন্ত আমি আহমদীয়া জামাত, নাইরোবীর প্রেসিডেন্ট ছিলাম এবং পরে জামাতের কার্যকরি পরিষদের সদস্য ছিলাম। আমি বিগত পনের বছর যাবৎ আহমদীয়া জামাত, নাইরোবীর হিসাবরক্ষক। ঘটনা বর্ণনার সময় বলেন, পনের বছর যাবৎ আমি জামাতের হিসাব রক্ষক আর আর তিন বছর যাবৎ সেক্রেটারী ওসীয়্যত ও যিয়াফতের দায়িত্বে আছি। ডাক্তার রহমত আলী সাহেব (রা.), সুফী নবী বখ্‌শ সাহেব একাউনটেন্ট এবং ডাক্তার বাশারত আহমদ সাহেব প্রমুখের যুগে, ১৯০০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমি এ দেশে আসি। ডাক্তার রহমত আলী সাহেবের উন্নত চরিত্র, স্নেহ-মমতা এবং মানবতাবোধ দেখে অনেককে আমি আহমদীয়া জামাতে দীক্ষা নিতে দেখেছি। এখানেই প্রথমবারের মত আমি যুগের পথপ্রদর্শকের আগমন বার্তা শোনার সুযোগ পেয়েছি। (দেখুন একজন মানুষের উন্নত চরিত্র, স্নেহ-মমতা এবং মানবতা দেখে অনেকের দৃষ্টি তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয় আর জানতে চায়, এ ব্যক্তি কে আর তার ধর্ম কি? এরপর তারা আহমদী হয়ে যায়)। তিনি বলেন, আমি আমার নিয়তির সিদ্ধান্ত আল্লাহ্‌র হাতে ছেড়ে দিলাম। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কাছে মিনতি করে বললাম, হে আল্লাহ্! আমার নিয়তিতে কী আছে আমি জানি না। অত্যন্ত বিগলিত চিত্তে, অবিচলতার সাথে প্রতিদিন তাহাজ্জুদ নামাযে এভাবে দোয়া করতে শুরু করলাম, হে আমার প্রিয় প্রভু-প্রতিপালক! হে অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত! তুমি আমার আকুতি শোন, আমাকে পথপ্রদর্শন কর এবং আমাকে সেই পথে পরিচালিত কর যা তোমার কাছে সত্য; যেন আমি হিদায়াত থেকে বঞ্চিত না হই। আমি একেবারেই অক্ষম, দুর্বল, পাপী এবং স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী, ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনি বলেন, আমার প্রভু আমার আকুতি শুনেন এবং আমি সত্য স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করি। আমাকে খুবই স্পষ্টভাবে দু'টি স্বপ্ন দেখান হল। আমি তখন পূর্ব আফ্রিকার সীমান্তবর্তী কসোমো জেলার কারিগু স্টেশনে একটি হাসপাতালের ইনচার্জ ছিলাম। ১৯০৫ সালের ৩০ জুন তারিখে আমি চিঠির মাধ্যমে খোদার প্রিয়ভাজন (মাহদী)-এর বয়আত করি। তিনি বলেন, এরপর থেকে ইবাদতে এমন তৃপ্তি পেতে লাগলাম যা ছিল কল্পনাতীত। কারণ, এটি ফিরিশ্‌তাদের অবতীর্ণ হবার যুগ ছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি যেসব নতুন ওহী হতো সেসব পূর্ণ হবার সংবাদ প্রতি ডাকে পেতাম। আর হযরত আকদাস (আ.)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য মনটা খুবই ছটফট করত আর দিন দিন অস্থিরতা বাড়তেই থাকে। (হুযুর বলেন) কারণ, তিনি তখনও তাঁর (আ.) হাতে সরাসরি বয়আত করেন নি বরং পত্র যোগে বয়আত করেছিলেন। তিনি বলেন, অবশেষে ছুটির সময় ঘনিয়ে এলো। আল্লাহ্ তা'লা আমার মনে প্রিয় মসীহ্‌কে কিছু উপহার দেয়ার প্রেরণা সঞ্চার করলেন। তাই আমি এখান থেকে চারটি উট পাখীর ডিম নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। এগুলো সংগ্রহ করতে এবং সাথে নিয়ে যাবার জন্য জার্মান বন্দর থেকে অনুমতি নেয়ার চেষ্টা করতে হল। এ অনুমতি পূর্ব আফ্রিকা হতে পাওয়া যেত না। তিনি বলেন, ১৯০৭ সালে আমি স্বদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। গুজরাত পৌঁছে দেখি, আমার মরহুম পিতা এবং ভাই সাহেব আহমদীয়াতের ঘোর বিরোধী। প্রতি নামাযে বিগলিত চিত্তে তাদের জন্য দোয়া করতে শুরু করলাম। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সাহায্য করলেন। অনেক আকুতি মিনতির সাথে দোয়া করার ফলে আমার পিতা, তার আরো কয়েকজন বন্ধু এবং আমার ভাই কাদিয়ানের সালানা জলসায় যেতে সম্মত হন। তিনি বলেন, গুজরাত জামাতের সঙ্গে আমরা ১৯০৭ সালে প্রিয় ভূমি কাদিয়ান পৌঁছি। সেখানে পৌঁছে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পাই, জামাত এবং বড় বড় বুযূর্গ ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ হযরত আকদাসের সাথে সাক্ষাতের জন্য ব্যাকুল হয়ে ছটফট করছেন, সাক্ষাৎ লাভের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন। আমি চরম বিচলিত হই আর দুঃশ্চিন্তারও কোন সীমা ছিল না। কেননা আমি অনেক দূরদেশ থেকে অল্প কয়েক দিনের জন্য দেশে এসেছি এবং সাক্ষাতের জন্য বিগত দু'বছর ধরে ছটফট করছি। আমার আন্তরিক বাসনা ছিল, আমি হযরত

আকদাস (আ.)- এর সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করব কিন্তু তা সম্ভব হবে বলে আমার মনে হচ্ছিল না। (হুযূর বলেন) অনেক লোকের সমাগমের কারণে একান্তে সাক্ষাৎ লাভ করতে পারবেন না বলে তার মনে হচ্ছিল। তিনি বলেন, গুজরাত জামাতের সদস্যরা অতিথিশালায় আহার করছিলেন আর আমি সাক্ষাৎ লাভের চিন্তায় মগ্ন ছিলাম এবং এর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। মসজিদে মুবারকের নিচের গলি দিয়ে যাচ্ছিলাম। সে সময় একজনকে সে পথ দিয়ে যেতে দেখে আমি তাকে বললাম, আমি অনেক দূরদেশ থেকে এসেছি এবং আমি হযরত আকদাস (আ.)-এর সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করতে চাই। দয়া করে আমাকে কোন উপায় বাতলে দিন। তিনি উত্তরে বলেন, হযরত আকদাস (আ.)-এর একজন বৃদ্ধা সেবিকা প্রায়ই এই দরজা দিয়ে যাতায়াত করে, আপনি তাকে বলুন। ইতোমধ্যে সেই বৃদ্ধাকে দেখতে পেলাম। আমি দৌড়ে গিয়ে তাকে বললাম, মা আমি অনেক দূরদেশ থেকে এসেছি আমি হযরত আকদাস (আ.)-এর সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করতে চাই। হুযূরের খিদমতে এই মুসাফীরের সংবাদটি পৌঁছে দিলে আমার প্রতি বড়ই কৃপা হবে। তিনি স্বস্নেহ ও সানন্দে বললেন, একটু অপেক্ষা কর আমি আসছি। তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই ফিরে আসেন এবং আমাকে সুসংবাদ দেন, আমার আশা পূর্ণ হয়েছে। হযরত আকদাস (আ.) আমাকে উপর তলায় ডাকছেন। আমি দৌড়ে আমার পিতা এবং আমার সাথে আগত অ-আহমদীদের ডেকে আনলাম। আমরা উপর তলায় পৌঁছে একটি উঠানে দাঁড়ানো মাত্রই দরজা খুলে হযরত আকদাস (আ.) বাইরে আসেন এবং আস্‌সালামু আলাইকুম বলেন। পরিতাপ! আমরা আগে সালাম দিতে পারলাম না, হযরত আকদাসই প্রথমে সালাম দিলেন। তিনি বলেন, আমার পিতা বিরোধী হওয়া সত্যেও হুযূর (আ.)- এর পায়ে লুটিয়ে পড়েন। হুযূর (আ.) পরম মমতায় স্বহস্তে তার মাথা ধরে উঠান এবং বলেন, শুধু আল্লাহ্ তা'লার সত্তাই সিজদার যোগ্য। বান্দাকে সিজদা করা যায় না। এরপর এই অধম উট পাখির চারটি ডিম নযরানা স্বরূপ হযরত আকদাস (আ.)-এর খিদমতে পেশ করলাম। হুযূর একান্ত দয়াপরবশ হয়ে তা গ্রহণ করেন এবং স্নেহের সাথে আমার কাছ থেকে আফি"কার খবরাখবর ও আমার সফর বৃত্তান্ত ইত্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি আমার হাত নিজ পবিত্র হাতে নিয়ে বললেন, পার্থিব জগতের প্রতি আসক্ত হওয়া সমীচীন নয়। তিনি (আ.) আরো বলেন, নিজেকে সেই যাত্রীর ন্যায় মনে করা উচিত যে টিকেট ক্রয় করে প্রতিক্ষালয়ে ট্রেনের জন্য অপেক্ষমান। তিনি (আ.) আমাকে অনেক বেশী ইস্তেগফার করতে বলেন। আর বলেন, নিয়মিত দোয়ার জন্য লিখতে থেকো। এরপর সঙ্গে করে যেসব অ-আহমদী নিয়ে গিয়েছিলেন তাদের দু'তিন জন সহ আমার পিতার বয়আত নেন। কোথায় সাক্ষাতের পূর্বে তারা ছিল বিরোধী কিন্তু প্রথম সাক্ষাতেই বয়আতের জন্য সবাই সম্মত হয়ে যায়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বয়আত শেষে একান্ত বিগলিত চিত্তে আমাদের জন্য দোয়া করেছেন, হুযূর (আ.)-এর চোখ ছিল অশ্রুসিক্ত। এমনকি আমাদের জন্যও অশ্রু সংবরণ করা কঠিন হয়ে গেল। আমাদের হৃদয় এতটা বিগলিত হয় যে, আজ পর্যন্ত হুযূরের পবিত্র হাতে হাত রাখা, হুযূরের জ্যোতির্ময় চেহারা দেখা, হুযূরের স্নেহভরা নির্মিলিত চোখ অশ্রু সিক্ত হওয়া এবং আমার মত নগণ্য ও দুর্বল পাপীর জন্য হিদায়াতের দোয়া করা, ইস্তেগফার করা এবং বারবার দোয়ার জন্য লিখতে নির্দেশ দেয়ার কথা যখন মনে হয় তখন আমার হৃদয়ে এক প্রকার বৈদ্যুতিক প্রভাব অনুভব করি আর অশ্রুতে চোখ ঝাপসা হয়ে যায়। কত কল্যাণময় যুগ ছিল সেটি। বিরোধিতার ভয়াবহ পাহাড়, সমুদ্র এবং বিরোধিতার তুফান খোদার প্রিয় নবীর দোয়ার ফলে আমরা স্বচক্ষে নিশ্চিহ্ন হতে দেখেছি। চরম শত্রুকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভিত-ত্রস্ত ও কম্পমান দেখেছি। অ-আহমদী আলেম ফাযেল তো দূরের কথা স্বয়ং জামাতে আহমদীয়ার বড়-বড় আলেমদের জ্ঞানও এই চতুর্দশী চাঁদের আলোর সামনে ম্লান দেখাচ্ছিল এবং হুযূরের উপস্থিতিতে কোন বিষয়ে কারো কথা বলারও সাহস হত না। মোটকথা, বয়আত করে নিলাম, দোয়ার পর হুযূর (আ.) আমার সাথে করমর্দন করে আমাকে ধন্য করলেন এবং আমাকে ফিরে যাবার অনুমতি দিলেন। তহসীলদার নবাব খাঁন সাহেব সহ আহমদীয়া জামাত, গুজরাটের সদস্যরা যখন আমার এই সাক্ষাতের বৃত্তান্ত শুনেন, তারা ঈর্ষা করে বলতে লাগলেন, আমাদেরকে কেন সাথে নিয়ে গেলে না।

গোলাম মুহাম্মদ সাহেবের পুত্র মাস্টার আব্দুর রউফ সাহেব (রা.)-এর একটি ঘটনা রয়েছে। তিনি বর্ণনা করেন, তার বয়আতের সন ১৮৯৮, সে বছরই তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাত করেছেন। তিনি বলেন, প্রাথমিক যুগে যখন আমার বয়স অল্প ছিল তখন ভেরা'র মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতাম। তখন আমাদের ভেরা গ্রামে গুঞ্জন উঠে, কাদিয়ানে জন্ম গ্রহণকারী এক ব্যক্তি– ইমাম মাহদী হবার দাবী করেছেন। ধীরে ধীরে আমাদের মহল্লাতেও এই সংবাদ পৌঁছে, এক ব্যক্তি ইমাম মাহদী হবার দাবী করেছেন, তার নাম মির্যা গোলাম আহমদ। তিনি বলেন, আমি ছোট বালক ছিলাম, ততটা জ্ঞান ছিল না। কিন্তু আমার ভাই গোলাম এলাহী বই-পুস্তক পড়ে বয়আত গ্রহণ করেন। তাঁর নাম ৩১৩ জন সাহাবীর তালিকায় অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। আঞ্জামে আথমে যে তালিকা রয়েছে তাঁর নাম সেখানে ২৪৯ নম্বরে মিস্ত্রী গোলাম এলাহী সাহেব ভেরা হিসাবে লিপিবদ্ধ আছে। যাহোক, তিনি বলেন, আমার ভাই পরিবারের সবার নাম বয়াতের পত্রভূক্ত করে পাঠিয়ে দেন। তখন আমিও মির্যা সাহেবের বই-পুস্তক এবং মহল্লায় যে সমস্ত বিজ্ঞাপন আসত সেগুলো পড়তাম। রাতে মসজিদেও এগুলো পড়ে শুনাতাম। গঙ্গাবিশন এবং আব্দুল্লাহ্ আথম সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনের কথা আজও স্মরণ আছে। যাহোক, মির্যা সাহেবের সাথে সাক্ষাত করার বাসনা হল। অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাত করতে আমার ইচ্ছে হল। আমি মাগরিবের নামাযের পর ভেরায় একটি পুলের উপর বসে দোয়া করতাম, হে আল্লাহ্! মির্যা সাহেব সত্যবাদী হয়ে থাকলে আমাকে কাদিয়ান পৌঁছাও আর মিথ্যাবাদী হয়ে থাকলে এখানেই রাখ অর্থাৎ আমি যেন ভেরাতেই থাকি কাদিয়ান যাবার কোন আবশ্যকতা যেন না হয়। তিনি লিখেন, দশম শ্রেণীর পরীক্ষা আমি রাওয়ালপিন্ডিতে দিয়েছি। ১৩১১ হিজরিতে যে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ হয়েছিল তা আমি স্বচক্ষে দেখেছি। তখন আমি মাধ্যমিকে পড়ি। আমি যখন ১৯৯৮ সালে পরীক্ষা দিয়ে শেষ করলাম, আমার ভাই গোলাম এলাহী নিজের সঙ্গে করে আমাকেও কাদিয়ান নিয়ে যান। তখন আমি মির্যা সাহেবের হাতে সরাসরি বয়আত করি। তখন মসজিদ খুবই ছোট ছিল। সেখানে কিছুদিন অবস্থান করে

আমার ভাইয়ের সাথে আবার নিজ গ্রাম ভেরায় ফিরে আসি। মৌলভী নূর উদ্দীন সাহেবের সাথে আমার ভাইয়ের পূর্ব পরিচয় ছিল। তাই তিনি আমার ভাইকে লিখেন, তোমার ভাইকে কাদিয়ান পাঠিয়ে দাও। অবশেষে আল্লাহ্‌র কৃপায় ১৮৯৯ সালে আবার কাদিয়ান যাই এবং মৌলভী সাহেব এবং হযরত সাহেবের সাথে সাক্ষাত করি। মৌলভী সাহেব আমার শিক্ষাগত যোগ্যতা কি তা জানতেন। আমি গরীব ছিলাম। অর্থাৎ যুগের শিক্ষার মান অনুসারে তিনি জানতেন যে, আমি শিক্ষিত কিন্তু গরীব ছিলাম, তাই মৌলভী সাহেব আমাকে স্কুলে চাকরি নিয়ে দিলেন আর ১৮৯৯ সালে মাসিক ৮ টাকা বেতনে সহকারী শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হলাম। তখন ষষ্ঠ-সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত ছিল। মাধ্যমিকের কাস হত না। আমি এই শিক্ষকতার কাজ ১৯০২ সাল পর্যন্ত করেছি। সে সময় মৌলভী শের আলী সাহেব স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পড়াতাম আর সেই সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামায হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সাথে পড়তাম। তখন মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব ইমামতী করতেন। পাঁচ বেলার নামাযের পরই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বৈঠকে বসতাম। হযরত সাহেব ঘর থেকে এসে নামাযের পূর্বে তাঁর ইলহাম, দিব্যদর্শন, রুইয়া এবং সত্য স্বপ্ন শুনাতেন। আমিও তা উপভোগ করতাম। নামাযের সময় সুযোগ পেলে তাঁর হাত-পা টিপে দিতাম। কিছুদিন হযরত সাহেব রাতের খাবার মসজিদে বসেই খান এবং আমিও অতিথিদের সাথে মসজিদে খাবার খেয়ে নিতাম। হযরত সাহেবের উচ্ছিষ্ট তাবাররুক (কল্যাণ-সিক্ত) হিসাবে খেয়ে নিতাম। মাগরিব নামাযের পর হযরত সাহেব মসজিদে মুবারকে হুযূরের জন্য নির্ধারিত আসনে বসতেন। বিভিন্ন ধরনের ঐশী বাণী, কাশ্‌ফ এবং স্বপ্ন শুনাতেন। যেমন মিস্টার ডুই, চেরাগ দ্বীন জাম্মুনী এবং ভীঁ নিবাসী করম দ্বীনের ব্যাপারে ওহী এবং স্বপ্ন ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত থাকত। এসব বিষয় বিভিন্ন পুস্তকে ছাপাও হয়ে গেছে। দ্বিতীয়বার লিখার প্রয়োজন নেই। মাস্টার আব্দুর রউফ সাহেব (রা.) সম্পর্কে টিকায় আরো লিখা আছে, তিনি সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার অবসরপ্রাপ্ত ছিলেন এবং সাবেক কার্ক, প্রধান কার্ক তালীমুল ইসলাম হাইস্কুল, কাদিয়ান ছিলেন। তিনি ১৮৯৯ সালে স্কুলে যোগদান করেন আর ১৯০২ সাল পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন। পরে তিনি 'রিভিউ অফ রিলিজিয়ন্স'-এর দপ্তরে কাজ করেন। এরপর ১৯০৬ থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত হাইস্কুলের প্রধান কার্ক ছিলেন। তিনি বলেন, আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে তখন থেকে মানতাম যখন চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ হয়েছে।

আর একটি ঘটনা বা রিওয়ায়েত হল, মৌলভী আব্দুল্লাহ্ সাহেবের পুত্র হযরত মৌলভী আব্দুল আযীয সাহেব (রা.)-এর। তিনি ১৯০৪ সালে বয়আত করেন। তিনি বলেন, বয়আত গ্রহণ এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে স্বচক্ষে দেখার বৃত্তান্ত তুলে ধরার পূর্বে আমি আমার মরহুম পিতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী মৌলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ সাহেব মগফুর-এর অবস্থা বর্ণনা করা আবশ্যক মনে করছি, তাঁর ঘটনাটিও খুবই চিত্তাকর্ষক। কেননা তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অনেক বড় পরীক্ষা নেয়ার চেষ্টা করেছেন আর সবদিক থেকে আশ্বস্ত হওয়ার পরই তিনি বয়আত করেছেন। যাহোক, তিনিও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র হাতে বয়আত করেছেন। তাঁর অনেক চাক্ষুষ ঘটনা রয়েছে, যেগুলি লিপিবদ্ধ করার পূর্বেই তিনি ইন্তেকাল করেছেন। এ কারণে আল্ ওলাদু সিররুল্ লি আবিহি অনুসারে তাঁর ঘটনা লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক মনে করছি। ফার্সীতে বলা হয়, অর্থাৎ, 'যে কাজ পিতা করতে পারেন নি, তাঁর ছেলে তা সম্পন্ন করেছে।' তিনি বলছেন, মোটকথা, গ্রাম ভেনী, পোষ্ট অফিস শরকপুর, জেলা শেখোপুরার অধিবাসী আমার সম্মানিত বুযূর্গ পিতা মৌলভী আব্দুল্লাহ্ সাহেব, একজন আহলে হাদীস আলেম ছিলেন। এলাকার অনেক বড় নেতা ছিলেন। মৌলভী মুহাম্মদ হোসেইন সাহেব বাটালভী এবং মৌলভী নযীর হোসেন সাহেব দেহলভী তাঁকে আঞ্জুমানে আহলে হাদীসের ডেপুটি কমিশনার নির্বাচন করেছিলেন। ঐ এলাকাতে তিনি অনেক বড় নেতা বলে গণ্য হতেন আর তাদের প্রতিনিধিত্ব করতেন। তিনি বলেন, তাঁর খ্যাতির কারণে গুরুদাসপুর জেলার গোলাম নবী যিনি আহলে হাদীসের নেতা ছিলেন, তাঁকে নিজের কাছে ডেকে পাঠান, আর তিনি উল্লেখ করেন, আমাদের কাছেই কাদিয়ান গ্রাম অবস্থিত যেখানে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব ইলহাম প্রাপ্তির দাবী করেছেন। তিনি এক মহান পুত্র সন্তান লাভের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যা পূর্ণ হয় নি। প্রথমে এক কন্য সন্তান জন্ম নিয়েছে, তারপর এক ছেলের জন্ম হয়েছে। (তিনি মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর কথা বলছিলেন যা অ-আহমদী মৌলভীরা তাকে বলেছে)। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে সেও মারা গেছে। চল, ঐ ব্যক্তির সাথে গিয়ে মুনাযেরা করা যাক। তার মতে ইলহাম অথবা ওহী ইত্যাদি হতে পারে না, অথচ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তা লাভের দাবী করতেন। তাকে বলা হয়, চলুন, তার সাথে গিয়ে আলোচনা করি। অতএব, যে দিনগুলোতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কোন দাবী করেন নি, শুধুমাত্র ইলহাম এর ধারা জারী ছিল আর হুযূর (আ.) বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তক রচনা করছিলেন, তিনি অর্থাৎ যার ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে তার পিতা কাদিয়ানে পৌঁছেন। হুযূরের সাথে উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে আলোচনা হয় অর্থাৎ মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে আলোচনা হয়। আর প্রশ্ন করা হয়, যদি আপনার ইলহামগুলি সঠিক হয়, তবে ছেলে সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী কেন পূর্ণ হয় নি? প্রথমে মেয়ে হয়েছে, তারপর ছেলে হয়েছে, সে আবার মারাও গেছে। ভবিষ্যদ্বাণী কী এ রকমই হয় নাকি? তিনি বলছেন, আমার বুযূর্গ পিতা বলতেন, একথা শুনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "মহানবী (সা.) হজ্বের ব্যাপারে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন কী? মৌলভী সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বলেন, হ্যাঁ! মহানবী (সা.)-এর হজ্ব সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর প্রেক্ষিতে বলেন, এটি কি ঐ বছরই পূর্ণ হয়েছিল? তিনি কি ঐ বছরই হজ্বব্রত পালন করে ফিরত এসেছিলেন? এতে তার পিতা মৌলভী সাহেব বলেন, ঐ বছর হজ্ব করেন নি কিন্তু এর পরের বছর তো করেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমি কখন বলেছি, এ বছরই ছেলে হবে? এটি খোদা তা'লার ভবিষ্যদ্বাণী যা পূর্ণ হবে, আর অবশ্যই হবে। যে বছরই পূর্ণ হোক না কেন। কেননা এর একটি নির্ধারিত মেয়াদ আছে, এক বছরের কথা কোথাও বলা হয় নি, বরং নির্দিষ্ট সময়ের কথা বলা হয়েছে। এখানেই আলোচনা শেষ হয়ে যায়। আর মৌলভী সাহেব নতুন কোন প্রশ্ন করেন নি। কিন্তু এ বিষয়ে তার অবস্থান অনড় ছিল যে, আপনার এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় নি। এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর

যে বিজ্ঞাপন ১৮৮৬ সালের ২২ মার্চ দিয়েছিলেন, তাতে সময়ও নির্ধারণ করে দেন, এই প্রতিশ্রুত সন্তান নয় বছরের মধ্যে জন্ম নিবে। এরপর উপুর্যপুরী কয়েকটি বিজ্ঞাপনে তা উল্লেখ করেন। তারপর তিনি নিজেই বর্ণনা করছেন, ঐ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ হযরত মুসলেহ্ মওউদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানীর জন্ম হয়েছে। এরপর তিনি বর্ণনা করছেন, মৌলভী সাহেব, অর্থাৎ তার পিতা যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে বির্তক করার জন্য এসেছিলেন, তিনি আরবী ও ফার্সীতে খুবই দক্ষতা রাখতেন। আরবী ব্যাকরণ, যুক্তিবিদ্যা, (ভাষা) অলঙ্কার শাস্ত্র ও রূপকের জ্ঞান ইত্যাদিতে ছিলেন অনন্য ব্যক্তিত্ব। তার জ্ঞানের ভিত্তিতেও এই নির্বাক করে দেয়ার মত উত্তর থেকে তিনি লাভবান হন নি অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে যে বির্তক হচ্ছিল, এটি থেকে তিনি কোন ফায়দা উঠান নি। আর এটিও বাস্তব সত্য, প্রত্যেক কাজের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় থাকে। ঐ সময়টি ছিল তার অস্বীকারের। তাই তিনি অস্বীকারের উপরই অটল থাকেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কথা মানেন নি। হুযূর (আ.) তাঁর জ্ঞান দেখে অর্থাৎ তার কথাবার্তা শুনে ধারণা করেছেন যে, তিনি জ্ঞানী মানুষ তাই দয়ার্দ্র হয়ে তাকে বলেন, মৌলভী সাহেব! আমি বিরুদ্ধবাদীদের বিভিন্ন আপত্তির খন্ডনে বারাহীনে আহমদীয়া নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছি এবং এতে দশ হাজার রূপীর চ্যালেঞ্জও দিয়েছি যা কিছু দিনের ভেতর প্রকাশিত হবে। আপনি এখানে অবস্থান করে মুদ্রনের জন্য প্রুফ দেখে দিতে পারলে ভাল হবে। আর এ কাজের পারিশ্রমিক যা-ই দাঁড়ায় আপনাকে দেয়া হবে। কিন্তু মৌলভী আব্দুল আযীয সাহেব তার পিতা সম্পর্কে লিখেন, পরিতাপ! তিনি এ প্রস্তাবে সম্মত না হয়ে এমনিই ফিরে যান। আর এই অস্বীকারের পর প্রায় ১৫/১৬ বছর নষ্ট হয়েছে। যদিও তিনি সম্মত হন নি কিন্তু তিনি প্রকৃতিগত ভাবে পুণ্যবান ছিলেন। তিনি বলেন, তার প্রকৃতিতে সততা এবং পুণ্য দুটোই ছিল। কেউ হযরত মসীহ্ মওউদকে গালমন্দ করলে বা অবমাননাকর কথা বললে তিন তাকে বাঁধা দিতেন এবং বলতেন, খোদা তা'লা কাফিরদের প্রতিমাগুলোকেও গালি দিতে বারণ করেছেন। অতএব, এমন কিছু বৈশিষ্ট্য তার মাঝে ছিল যা পরবর্তীতে তার হিদায়াতের কারণ হয়েছে। এরপর বর্ণনা করেন, এই নিরবতার মাঝেই ১৫/১৬ বছর সময় অতিবাহিত হয় এবং এরই মধ্যে ১৯০২ সাল এসে যায়। এ সময় তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর 'জঙ্গে মুকাদ্দাস' এবং 'আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম' বই দু'টি পড়েছিলেন, যারফলে মৌলভী সাহেবের মাথায় যেসব প্রশ্ন দেখা দিত এর বেশ ক'টির সমাধান হয়ে যায়। এই বই দু'টি পড়ে অনেক প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন ঠিকই কিন্তু অনেক নতুন আপত্তিও দেখা দেয়। যেসব আপত্তির সৃষ্টি হয়েছে এর ২১টি তিনি প্রশ্নাকারে নোট করে নেন। আর ১৯০২ সালে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে ধর্মীয় বিতর্কের জন্য কাদিয়ানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সেখানে গিয়ে সরাসরি মসজিদে মুবারকে উপস্থিত হন। সেখানে বসবাসরত কাউকে কিছু বলেন নি, কিছু জিজ্ঞেসও করেন নি। কোন এক নামাযের সময় সোজা মসজিদে মুবারকে গিয়ে উপস্থিত হন এবং বাজামাত নামায পড়েন। কাউকে কিছু বলেন নি, কেন বলেন নি তা পরে আসছে। যে কারণে কাউকে কিছু বলেন নি তা হল, অদ্ভুত অদ্ভুত ও অলিক কিছু গল্প প্রচলিত ছিল, যেমন বলা হয় পীরদের রীতি অনুসারে মির্যা সাহেব কিছু এজেন্ট রেখেছেন, যারা আগত অতিথিদের কাছে প্রথমে সবকিছু জিজ্ঞাসা করে নেয় আর ভেতরে সব তথ্য পৌঁছে দেয়। মির্যা সাহেব যে কক্ষে থাকেন তার অনেকগুলো দরজা আছে। প্রত্যেক কাজের জন্য জন্য পৃথক পৃথক দরজা নির্ধারিত রয়েছে। মির্যা সাহেব যেহেতু পূর্ব থেকেই অবহিত থাকতেন তাই অতিথি ভেতরে প্রবেশ করামাত্রই তিনি বলে দিতেন, আপনার নাম এই এবং আপনি অমুক জায়গা থেকে অমুক কাজের জন্য এসেছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। আর এসব কথার ফলে অতিথি খুবই প্রভাবিত হত আর তাঁর প্রতি বিশ্বাস জন্মাত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সম্বন্ধে এমন অলিক গল্প প্রচলিত ছিল বলে তিনি কাউকে কিছু বলেন নি। তিনি লিখেন, মির্যা সাহেবের এমন কথায় এ অতিথির মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় যে, ইনি নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্‌র ওলী, কেননা তিনি নিজে থেকেই সব কিছু বলে দিচ্ছেন। মোটকথা, তখন মৌলভী সাহেবের মনেও এ ধারণা ছিল। তিনি সিদ্ধান্ত করে রেখেছিলন, আমাকে যদি কেউ কিছু জিজ্ঞেস করে তাহলে আমি কিছুই বলব না। কাজেই তিনি সোজা মসজিদে যান এবং কারো কাছে কিছু জিজ্ঞেস করেন নি। তিনি নিজেই বলেন, পরে এ কথা ভুল প্রমাণিত হয়েছে এবং এগুলো বিরোধীদের দেয়া অপবাদ ছিল মাত্র। যাহোক, তখন যেহেতু নামাযের সময় ছিল বা নামায হচ্ছিল তাই তিনি বাজামাত নামায পড়েন। নামাযের পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর আসনে বসেন এবং অন্যরা এদিক সেদিক ছড়িয়ে বসেন। আস্‌সালামু আলাইকুম বলার পর মৌলভী সাহেব চুপিসারে হুযূর (আ.)-এর পা টিপতে আরম্ভ করেন। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে বলেন, আল্লাহ্‌র নবীর পরীক্ষা নেয়া ভালো নয়। পা টেপা তার আসল উদ্দেশ্য ছিল না। মূল উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন যার বর্ণনা পরে আসবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আল্লাহ্‌র নবীকে পরীক্ষা করা ভালো না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লা এই ধারণা সঞ্চার করেন, এটি তার নিষ্ঠাপূর্ণ পা টেপা নয় বরং অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে। যাহোক, তিনি বলেন, এটি একটি নিদর্শন ছিল যা তিনি হুযূরের সাথে প্রথম সাক্ষাতেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এটি তার ঈমানী চেতনা লাভে সহায়ক হয়েছে; ছেলে পিতা সম্বন্ধে একথা বলছেন। যাহোক, আলহামদুলিল্লাহ্। শ্রদ্ধেয় মৌলভী সাহেব বলতেন, মূল ঘটনা হল, আমি একটি হাদীস বা রিওয়ায়েতে দেখেছিলাম, হযরত ইমাম মাহদীর সত্যতার একটি নির্দশন বা আলামত হল, তাঁর পা খড়ম পায়া হবে না বরং সোজা হবে, সমতল পা যেমন হয় আর কি। পায়ের তালুতে বেশি গর্ত থাকবে না। তিনি এটি দেখার জন্য হুযূর (আ.)-এর পা ধরে ছিলেন। টিপে দেয়ার উদ্দেশ্যে নয় বরং খড়ম পায়া কিনা তা দেখার জন্য। পা ধরার ফলে তিনি দু'টি নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেছেন। একটি হল, মহানবী (সা.)-এর কথা অনুযায়ী বাস্তবেও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পায়ের পাতায় বেশি বাঁক ছিল না। দ্বিতীয়টি হল, হুযূর (আ.) বলেছেন, খোদার নবীর পরীক্ষা নেয়া ভালো না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এ কথা কেউ বলে দেয় নি। অনেক লোকই হুযূর (আ.)-এর পা টিপে দিত, কিন্তু কখনো তিনি এ কথা বলেন নি যা তিনি তখন বলেছিলেন, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নবীর পরীক্ষা নেয়া ভালো না। এ ধারণা কীভাবে জন্মাল, তখন যে ব্যক্তি পা টিপে দিচ্ছিল সে আসলে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে পা টিপে দিচ্ছিল? আর বাস্তবেও তখন

পরীক্ষার উদ্দেশ্যেই পা টিপা হচ্ছিল। অতএব, এটি একটি সুস্পষ্ট নির্দশন ছিল যা তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং ঈমানের সজিবতা অর্জন করেছেন। আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মদ। এরপর মৌলভী সাহেব বলেন, হুযূর! আমার কিছু প্রশ্ন ছিল। অনুমতি দিলে প্রশ্নগুলো উত্থাপন করব। হুযূর (আ.) অনুমতি দিলেন। মৌলভী সাহেব প্রথম প্রশ্ন উত্থাপন করেন। মৌলবী সাহেব এবং হযরত সাহেবের মাঝে যেভাবে কথোপকথন বা সংলাপ হয় তা হুবহু লিপিবদ্ধ করা হল।

মৌলবী সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, মহানবী (সা.)-এর একজন দুধ-মা ছিলেন। তাঁর নাম ছিল হযরত উম্মে আয়মান, যাকে হুযূর (সা.) প্রতিদিন অথবা প্রায়শ গিয়ে নতুন ওহী শুনাতেন এবং তিনি আনন্দিত হতেন। ওহী শুনে আনন্দিত হতেন। হুযূর (সা.)-এর মৃত্যু পর্যন্ত এ রীতি অব্যাহত ছিল এরপর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনিও একদিন দুধ মায়ের সাথে সাক্ষাতের জন্য যান অর্থাৎ উম্মে আয়মানের সাথে। তখন উম্মে আয়মন কাঁদতে আরম্ভ করেন। তিনি বলেন, আপনি কি হুযূর (সা.)-এর মৃত্যুর কারণে কাঁদছেন? এটি আল্লাহ্ তা'লার সুন্নত বা নিয়ম– যা পূর্ণ হয়েছে। আম্মা জান বলেন, না বরং আমি এ জন্য কান্না করছি যে ওহী বন্ধ হয়ে গেল। অতএব আম্মা জান সাহেবা যখন ওহী বন্ধ বলে স্বীকার করেন তখন আপনি কীভাবে হুযূর (সা.)-এর পর ওহী নাযিল হওয়ার বিশ্বাস রাখেন? এটি ছিল মৌলভী সাহেবের প্রশ্ন। অনেক দীর্ঘ ভূমিকার পর এ প্রশ্নটি করা হয়েছিল। অর্থাৎ হুযূর (সা.)-এর জীবনাবসানে ওহীর ধারা বন্ধ হয়ে গেছে তবে এখন কীভাবে ওহী হতে পারে অথচ আপনি বলেন, আমার প্রতি ওহী হয়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আপনি কী 'কুনতুম খায়রা উম্মাতিন' অনুযায়ী স্বীকার করেন যে, এ উম্মত সর্বোত্তম উম্মত? মৌলভী সাহেব বলেন, হ্যাঁ, আমি স্বীকার করি। হযরত আকদাস (আ.) বলেন, আপনি কি বিশ্বাস করেন, 'আওহায়তু ইলাল হাওয়ারিয়্যিনা', 'ওয়া আওহাইনা ইলা উম্মি মূসা', 'ওয়া আওহা রাব্বুকা ইলান্নাহলি'- অনুসারে মসীহ্‌র হাওয়ারীগণ, মূসার মা এবং মৌমাছির প্রতি ওহী হয়েছে আর ওহী হয়। মৌলভী সাহেব বললেন যে, হ্যাঁ, অবশ্যই হতো এবং হয়। (এটি সুন্দর একটি তবলীগি মুনাযিরা চলছিল)। হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, তবে কি মসীহ্‌র হাওয়ারী এবং মূসার উম্মতের মহিলারা এবং নিম্ন প্রজাতির বিভিন্ন প্রাণীর চেয়েও এ উম্মত নিকৃষ্ট? তাদের প্রতি ওহী হত অথচ মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মত, যারা সর্বোত্তম উম্মত, তাদের প্রতি ওহী হবে না? মৌলভী সাহেব বললেন, ঐসব ওহীর ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে। উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মাঝেও ওহী হবে এটি কি কোন স্থানে উল্লেখ আছে? তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'যখন আপনি এটি স্বীকার করেন যে, পূর্ববর্তী উম্মতের উপর ওহী হত আবার এদিকে আল্লাহ্ তা'লা সূরা ফাতিহাতে দোয়া শিখিয়েছেন, (আপনি বিশ্বাস করেন, যে সূরা ছাড়া নামাযই হয় না। আর প্রত্যেক রাকাতে এটি পাঠ করা আবশ্যক)। "সিরাতাল্লাযীনা আনআমতা আলাইহিম।" অর্থাৎ, খোদা আমাদের সেসব লোকের পথ প্রদর্শন কর যাদেরকে তুমি পুরষ্কৃত করেছ। আর সেই ঈমানও আমাদের দান কর। অতএব, সেসব লোকের মাঝে যেহেতু ওহীর পুরষ্কার বিদ্যমান ছিল, প্রশ্ন হল– দোয়ার ফলশ্রুতিতে এই উম্মতের মাঝে কেন ওহী হবে না? {দ্বিতীয়ত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বললেন}, দ্বিতীয় কথা হল,

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ

(সূরা হা মীম আস্ সাজদা:৩১) অর্থাৎ, যারা বলে, আমাদের প্রভু আল্লাহ্ তা'লা এবং এ দাবীর উপর অবিচল থাকে তাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ হয় এবং তারা বলে, তোমরা চিন্তিত হয়ো না এবং দুঃখিত হয়ো না এবং তোমাদেরকে সেই জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হচ্ছে যার অঙ্গীকার তোমাদের সাথে করা হয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এই আয়াত থেকে প্রমাণিত, ফিরিশ্‌তার মাধ্যমে এ উম্মতের মু'মিনীন এবং অবিচল ও দৃঢ়চিত্তদের প্রতি ওহী অবতীর্ণ হওয়া অবধারিত। (এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন), তৃতীয় আয়াত হল,

لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

(সূরা ইউনুস: ৬৫) অর্থাৎ, খায়রে উম্মতের মু'মিনরা এই পার্থিব জীবনেও সুসংবাদ লাভ করবে এবং পরকালেও। অতএব, এই সুসংবাদ ওহী না হলে আর কী হবে? এই বিষয়ে হুযূর (আ.) আরো অনেক আয়াত ওহী অবতীর্ণ হবার প্রমাণ স্বরূপ উপস্থাপন করেন। এই ধর্মীয় বাহাস চলাকালে মৌলভী সাহেব বলেন, হুযূর এটি ঠিক কথা যে, এই আয়াত সমূহ দ্বারা নুযূলে ওহী প্রতীয়মান হয়। কিন্তু প্রশ্ন হল, কুরআনে এই উম্মতের জন্য যেখানে ওহী নাযিল হবার প্রমাণ রয়েছে সেখানে হযরত আম্মা জান এটি কেন বললেন, 'ইনকেতাআতুল ওহী' অর্থাৎ, আজ ওহী বন্ধ হয়ে গেছে? তিনি এই আয়াতগুলো সম্পর্কে কী জানতেন না? হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মৌলভী সাহেব! বলুন তো, এখানে 'আল্ ওহীর' উপর 'আল্' কেন এসেছে? এই 'আল্' ঐ ওহীর প্রতি ইশারা করছে যা হুযূর (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ হত আর হুযূর প্রতিদিন আম্মা জানকে শুনাতেন। তাই সেই কুরআনী এবং শরীয়তবাহী ওহী যা হুযূর (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ হত তা নিশ্চিতভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং হয়ে গেছে। এটি কোথায় লিখা আছে যে, কিয়ামত পর্যন্ত সব ধরনের ওহী বন্ধ? অথচ কুরআনী আয়াতে ওহী অবতীর্ণ হবার কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। মৌলভী সাহেব এ কথা শুনে নিরব হয়ে যান, এরপর আর নতুনকোন প্রশ্ন করেন নি। একুশটি প্রশ্ন থেকে কেবল একটি প্রশ্নই করেন আর নিশ্চিন্ত হয়ে উঠে চলে যান। তারপর হযরত আকদাস (আ.) একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করেন, তাতে সেসব প্রশ্নের উত্তর এসে যায় যা মৌলভী সাহেব নোট করে নিয়ে এসেছিলেন এবং তা তার পকেটস্থই ছিল। এই সাক্ষাতের পূর্বে এ প্রশ্নগুলোর কথা তিনি কারো কাছে উল্লেখও করে নি। মৌলভী সাহেব তখন অবাক হয়ে চিন্তা করেন, এ ব্যক্তির প্রতি যদি ওহী না হয় তাহলে এসব কথা এবং প্রশ্নের খবর তাকে কে দিল যা তার কাছে লেখা ছিল অর্থাৎ তার পকেটে ছিল। তিনি বলেন, যখন দেখলাম আমার সকল প্রশ্ন যা আমার পকেটে ছিল তার উত্তরও না চাইতেই মসীহ্ মওউদ (আ.) দিয়ে দিয়েছেন। তখন আমি কিছুক্ষণ নিরব থেকে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিকট নিবেদন করি হুযূর, আপনার হাত দিন– আমি আপনার হাতে বয়আত করতে চাই। অতএব, তিনি সেই মুহূর্তে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় বয়আত করেন এবং পরবর্তীতে আর কোন দিন তাঁর হৃদয়ে হুযূর (আ.)-এর সত্যতা সম্পর্কে কোন ধরনের প্রশ্ন জাগে নি বরং

তাঁর ঈমান ও তত্ত্বজ্ঞান উত্তরোত্তর উন্নতি করতে থাকে। আলহামদুলিল্লাহি আলা যালেক।

তিনি অর্থাৎ তাঁর পুত্র আরো লিখেন, পরবর্তীতে তিনি কোন প্রকার উচ্চবাচ্য না করে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর বয়আতকারীদের গন্ডিভূক্ত হন। দ্বিতীয় খিলাফতের যুগেও হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর হাতে বয়আত করেন, তখনও তার হৃদয়ে কোনরূপ সন্দেহ বা সংশয়ের সৃষ্টি হয় নি। আলহামদুলিল্লাহি আলা যালিক।

তাঁর ছেলে লিখেন, আমার পিতা যখন বয়আত করে ফেরত চলে যান তখন যে এলাকায় তিনি থাকতেন অর্থাৎ, দো আবা বারি এবং চেনাবের অধিকাংশ মানুষ যারা তাঁর ভক্ত ছিল, শত্রু হয়ে যায়। অথচ ধারণা ছিল, যদি মৌলভী সাহেব মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেন তবে তারা সবাই তাঁর সাথে বয়আত করবে কিন্তু বাস্তবে যা ঘটেছে তা হল, সবাই তাঁর শত্রু হয়ে যায় এবং তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র আঁটতে থাকে। কিন্তু তিনি দৃঢ়চিত্তে তাদের মোকাবিলা করেন আর প্রেমিকের একাগ্রতা নিয়ে তবলীগের কাজ অব্যাহত রাখেন এবং প্রায় আঠার বছর তিনি অবৈতনিক মুবাল্লেগ ছিলেন এবং তাঁর মাধ্যমে প্রায় তিনশ' বা ততোধিক মানুষ জামাতভূক্ত হয়।

এই হল কয়েকটি রিওয়ায়েত বা ঘটনা যা আমি বর্ণনা করলাম। সেসব মানুষের ঘটনা, যাঁরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করে আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি করেছেন, আল্লাহ্ তা'লার সত্তা সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞানে উন্নতি করেছেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি ভালবাসার নতুন দিগন্ত তাদের সামনে উম্মোচিত হয় আর এ কারণেই হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নিষ্ঠাবান প্রেমিকের প্রতি তাঁদের বিশ্বস্ততা, নিষ্ঠা ও ভালবাসা ছিল সকল জাগতিক সম্পর্কের তুলনায় অধিক উন্নত। আল্লাহ্ তা'লা ঐসব প্রবীণের প্রতি সহস্র সহস্র কৃপা ও কল্যাণ বর্ষণ করুন এবং আমাদেরকেও যুগ ইমামের বয়আতের সুবাদে অর্পিত দায়িত্ব পালনের তৌফীক দান করুন। এছাড়া আমরাও যেন নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সাধন করতে পারি এবং এদিকে মনোযোগী হই।

জুমুআয় আসার পূর্বে একটি বেদনাদায়ক সংবাদ এসেছে, তবে এখনও বিস্তারিত খবর পাওয়া যায় নি। করাচিতে সম্ভবত জুমুআর নামাযের পরপরই একটি পরিবার ফেরত যাচ্ছিল, (তাদের মাঝে) নাযেম উমুরে তোলাবা ছিলেন, তিনি এবং তার পরিবার ঘরে ফেরত যাচ্ছিল। তিনি স্বয়ং মোটর সাইকেলে ছিলেন এবং পরিবারের অন্যরা ছিল গাড়িতে, তাকে লক্ষ্য করে গুলি করা হয়। তিনি ঘটনাস্থলেই শাহাদাত বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

আর গাড়িতে তার পিতা ও অপরাপর আত্মীয়স্বজন ছিলেন, তারা আহত হয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা শহীদ মরহুমের মর্যাদা উন্নীত করুন, বিস্তারিত খবর পেলে জানা যাবে যে, আসলে কি হয়েছিল। মোটকথা, যারা আহত হয়েছেন তাদের ব্যাপারে জানা গেছে, তারা আশংকা মুক্ত, কিন্তু দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে শঙ্কামুক্ত করেন এবং আশু আরোগ্য দান করেন।

এমনিভাবে ঘাটিয়ালিয়া থেকেও একটি শাহাদতের খবর এসেছে। আল্লাহ্ তা'লা এসব শহীদের পদমর্যাদা উন্নীত করুন। আর আমি যেমনি বলেছি, যারা আহত হয়েছেন তাদের জন্য দোয়া করুন। বর্তমানে পাকিস্তানের সার্বিক অবস্থার জন্য অনেক বেশি দোয়া করা প্রয়োজন। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক আহমদীকে সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন।

এ ছাড়া আমি একটি গায়েবানা জানাযাও পড়াব। এটি রাবোয়ার জনাব সাইয়্যেদ আব্দুল গনী শাহ্ সাহেব মরহুমেরর স্ত্রী সাইয়্যেদা আমাতুর রহমান সাহেবার জানাযা। দীর্ঘদিন রোগ ভোগের পর গত ১৫ অক্টোবর তিনি মৃত্যু বরণ করেন,

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত কুরায়শী আব্দুর রহমান সাহেবের কন্যা ছিলেন। অত্যন্ত পুণ্যবতী, নিয়মিত নামায ও সিয়াম সাধনায় ব্রতী ছিলেন। সামর্থের তুলনায় বেশি আর্থিক কুরবানীতে অংশ নিতেন, আত্মত্যাগী এবং অতিথি পরায়ণ ও কোমল স্বভাবের মহিলা ছিলেন। খুবই বিনয়ের সাথে জীবন যাপন করতেন।

পাকিস্তানে যখন জলসা হত তখন প্রায় পঞ্চাশ জন অতিথি তার বাড়িতে অতিথি সেবা পেতেন। অতিথিশালার খাবার ছাড়াও কিছু না কিছু খাবার তাদের সবার জন্য তিনিও রান্না করতেন।

এ ছাড়া সর্বদা চায়ের ব্যবস্থা রাখতেন। অনেক দরিদ্র মেয়ের বিয়ের সময় যখন জানতে পারতেন যে, দারিদ্রের কারণে আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে তারা কোন গহনা পায় নি, তখন তিনি নিজের কোন না কোন গহনা তাদের দিয়ে দিতেন। ফলে ধীরে ধীরে তাঁর নিজের সব গহনা-গাটিও শেষ হয়ে গেছে। সন্তানদেরকে সর্বদা জামাতের খিদমতের আদেশ দিতেন আর এর ফলে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তার সন্তানেরা জামাতের সেবা করার সৌভাগ্য পাচ্ছেন।

১৯৫৩ সালে তিনি ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভূক্ত হবার সৌভাগ্য লাভ করেন। তাঁর সন্তানদের মধ্যে দুই ছেলে ওয়াকেফে যিন্দেগী। একজন সেখানে ওয়াকফে জাদীদের মোয়াল্লেম। আরেকজন জামাতের মোবাল্লেগ– আব্দুল্লাহ্ নাদিম সাহেব প্রথমে স্পেনে ছিলেন এবং বর্তমানে চিলিতে আছেন। তিনি মায়ের জানাযায় যোগ দিতে পারেন নি।

আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে শক্তি, সাহস এবং ধৈর্য দান করুন। আর সন্তানদেরকে মায়ের পুণ্যসমূহ ধরে রাখার সুযোগ ও সামর্থ দান করুন। এমনিভাবে তাঁর একজন পৌত্রও জামাতের মুরব্বী আর বর্তমানে নাযারাতে ইশাআত রাবওয়াতে কর্মরত আছেন। একইভাবে তাঁর জামাতা মুনির আহমদ জাভেদ সাহেব এখানে প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসেবে কর্মরত আছেন। তাঁর বংশে চারজন ওয়াকেফে যিন্দেগী রয়েছেন। সন্তানদেরকে ঘিরে তাঁর যেসব স্বপ্ন ছিল আল্লাহ্ তা'লা তা পূর্ণ করুন।

আর আল্লাহ্ তা'লা তাদের পুণ্যের ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর উন্নতি দান করুন এবং মরহুমার মর্যাদা উন্নীত করুন। অন্য সন্তানদেরকে দৃঢ় মনোবল ও সৎসাহস দান করুন। (আমীন)

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)

জুমুআর খুতবা

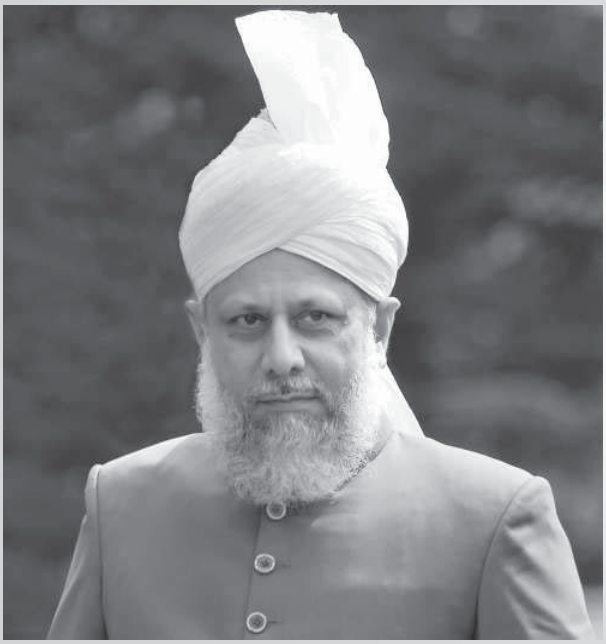

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্ত"ক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ১২ অক্টোবর ২০১২-এর (১২ তাবূক, ১৩৯১ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

আমি যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সম্মানিত সাহাবীদের ঘটনাবলী বর্ণনা করি তখন যে সাহাবীর ঘটনা বর্ণীত হয় তাঁর সন্তান ও বংশধররা আনন্দের সাথে চিঠি লিখেন এবং দোয়ার জন্যেও বলেন - হুযূর দোয়া করুন, আমাদের পিতামহ ও প্রপিতামহ বা প্রমাতামহ, দাদী ও বড় দাদীরা যুগ ইমাম ও মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান প্রেমিকের হাতে বয়আত করার মাধ্যমে আমাদেরকে যে সম্মানে ভূষিত করেছেন আমরা এবং আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম যেন সেই সম্মান ধরে রাখতে পারি। তাঁরা সেই যুগ পেয়েছেন এবং যুগ ইমামের সাহচর্যে সরাসরি কল্যাণমন্ডিত হয়েছেন। কিন্তু একটি ঘটনায় আমি খুবই আশ্চর্য হয়েছি, যখন শুনেছি কেউ কেউ এমনও আছে যারা তাদের জ্যেষ্ঠদের বা সম্মানিত পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে আপত্তি করে বলে, তারা পিতা-মাতাকে পরিত্যাগ করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে এসে ভুল করেছেন। সেই প্রবীণদের অবস্থা ও ঘটনা সম্বন্ধে সঠিকভাবে না জানার কারণে তাদের মনে এ ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। এখন সেসব বুযূর্গের ঘটনাবলী যখন আমি বলা শুরু করেছি তখন এমন ভুল ধারণা পোষণকারী একটি পরিবারের একজন আমার সাথে যোগাযোগ করে বলেন, অমুক বুযূর্গের ঘটনা বর্ণনার কল্যাণে তাঁর সম্পর্কে আমার মনে যেসব ভুল ধারণা বা বিভ্রান্তিকর প্রশ্ন ছিল তা আপনি দূর করে দিয়েছেন। অতএব, পবিত্র সাহাবীদের সম্পর্কে ঘটনাবলী বর্ণনার কল্যাণে কোন কোন বুযূর্গ সম্পর্কে তাঁদের পরিবারের সদস্যদের মনে যেসব ভুল ধারণা থাকে তা দূরীভূত হয় এবং এটি তাঁদের উত্তরসূরীদেরকে জামাতের কাছে আনার কারণ হয়। এজন্য আমি বারবার বলেছি এবং আমার পূর্বের খলীফাগণও বারবার বলেছেন, বিশেষ করে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) সাহাবায়ে কেরামের ঘটনাবলী বর্ণনা করা শুরু করেছিলেন। কিছু ঘটনা বর্ণনার পর পরবর্তীতে তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাই পরবর্তী প্রজন্মকে তাদের প্রবীণদের ঘটনাবলী, পরিবেশ, পরিস্থিতি ও ইতিহাসের স্মৃতিচারণ করতে থাকা উচিত। যাতে জামাতের সাথে পরবর্তী

প্রজন্মের দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে উঠে আর তাদের যেন উত্তম তরবীয়ত হয়। এখানে একথাও বলে রাখি, জামাতের কিছু সদস্য বা কর্মকর্তার আচরণের কারণে সাহাবীদের পরিবারের কোন কোন সদস্য জামাত থেকে দূরে সরে যায়। শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়, তারা বলে বসে, আমাদের প্রবীণরা ভুল করেছিলেন।

অতএব এমন লোকদের ছোটখাট বিষয় দুঃখিত হবার পরিবর্তে আল্লাহ্ তা'লার কাছে সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্যে এবং যারা এ সমস্যার কারণ তাদের জন্যেও দোয়া করা উচিত। সর্বদা মনে রাখবেন, আমাদের পূর্বপুরুষরা অনেক গবেষণা করে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন। অথবা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সরাসরি নির্দেশনা পেয়ে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন। বর্তমান প্রজন্মের ভুল থাকতে পারে, কেননা আল্লাহ্‌র সাথে এদের সম্পর্ক এত গভীর নয় যেমনটি ছিল পূববর্তী সেই সম্মানিত লোকদের। অতএব, সর্বদা একথা মনে রাখবেন, তারা ভুল করেন নি। ন্যায়ের দাবী হল, আপনারা নিরপেক্ষভাবে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন সর্বদা সরল সোজা পথে পরিচালিত করেন এবং কখনো যেন এমন অবস্থা সৃষ্টি না হয় যা তাদের বা আমাদের কাউকে ধর্ম থেকে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। এমন লোকেরা যদি আত্মবিশ্লেষণ করেন তবে তারা বুঝতে পারবেন, তাদের অহমিকা বা নির্বুদ্ধিতা এসব ছোটখাট বিষয়কে ধর্মের বিপরীতে দাঁড় করিয়ে তাদেরকে ধর্ম থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

অতএব সাহাবীদের সন্তানদের মধ্যে থেকে যারা ধর্ম থেকে বা জামাতী ব্যবস্থাপনা থেকে দূরে সরে গেছে, তা যে কারণেই হোক না কেন বা যাদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা ও অহংকার তাদের উপর ছেয়ে আছে, তাদের উচিত তারা যেন সঠিক পথে চলার জন্য সর্বদা দোয়া অব্যাহত রাখে।

আপনারা আপনাদের প্রবীণদের অনুগ্রহসমূহ স্মরণ রাখবেন। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ হল, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মেনে আমাদের রক্তে এই কল্যাণধারাকে প্রবাহিত করা। আল্লাহ্ করুন, সাহাবীদের উত্তরসূরীরাও যেন চিরকাল ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন এবং তাঁদের জন্য দোয়া করেন আর তাদের মনে যেন কোন প্রকার অভিযোগ দানা না বাঁধে।

আজ এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর আমি সাহাবীদের (রা.) ঘটনাবলী বর্ণনা করছি। প্রথম ঘটনাটি নূর মুহাম্মদ সাহেবের ছেলে হযরত মুহাম্মদ ফাযেল সাহেব (রা.)-র। তিনি বলেন, একরাতে এশার নামাযের পর আমি মৌলভী সুলতান আহমদ হামীদ সাহেবের কাছে জিজ্ঞেস করলাম, মৌলভী সাহেব! হযরত মির্যা সাহেব যে মাহ্‌দী ও মসীহ্ হবার দাবী করেছেন যদি তিনি সত্য দাবীকারক হয়ে থাকেন, আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে আমাদের দেশে আবির্ভূত করা সত্ত্বেও আমরা যদি তাঁকে শনাক্ত করতে ব্যর্থ হই তা হলে কি হবে? আমরা কি সেখানে গিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাত করার মত কষ্টটুকুও সহ্য করতে পারি না? মৌলভী সাহেব যেহেতু পরিস্কার মনের অধিকারী এবং নম্র স্বভাবের মানুষ ছিলেন তাই তিনি উত্তরে বলেন, অবশ্যই যাওয়া উচিত। আমি তাঁর কাছ থেকে (কাদিয়ান যাওয়ার) দৃঢ় অঙ্গীকার নিলাম। মৌলভী সাহেব চলে গেলেন এবং আমি শুয়ে পড়লাম। হুযূর (আই.) বলেন, তিনি বলেছেন, মৌলভী সাহেব সেই বৈঠক ছেড়ে চলে গেলে আমি ঘুমিয়ে গেলাম। তিনি লিখেন, 'আমি স্বপ্নে দেখলাম, খুব সুন্দর একটি বাড়ি, তাতে খুব সম্ভব চারটি দরজা রয়েছে, আর বাড়িটি দক্ষিণ মুখী এবং এর পূর্ব পাশে একটি মাঠ, যাতে সাদা পোষাক পরিহিত সম্মানিত লোকদের একটি বড় সমাবেশ চলছে। আর তাদেরকে ঐশী গুণাবলীর অধিকারী বলে মনে হল, তারা দলবদ্ধভাবে বসে আছেন, তাদের সংখ্যা প্রায় শতাধীক। আর আমিও তাদের মাঝে বসে আছি। ইতিমধ্যে এ বাড়ির পূর্ব দিকের দরজা থেকে জ্যোতির্ময় চেহারা বিশিষ্ট এক ব্যক্তি বাহিরে আসলেন, যিনি সাদা দাড়ি ও পাগড়ী পরিহিত ছিলেন, যার ঔজ্জ্বল্য এখনো আমার চোখে ভাসছে। তিনি বাহিরে আসেন এবং সেই সমাবেশের দিকে মুখ করে দাঁড়ান। তখন আমি সেই সমাবেশের মাঝে দাঁড়িয়ে আছি। সেই জ্যোতির্মন্ডিত চেহারা বিশিষ্ট লোকটি আমার দিকে শাহাদত অগুলি নির্দেশ করে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তোমার সকল পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন। সাথে সাথে আমার মনে উদয় হল, এই সম্মানিত বুযূর্গ মহানবী (সা.)। এরপর আমি দরূদ পড়তে শুরু করলাম এবং আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল।' আমি এত আনন্দিত ছিলাম যে, আর ঘুমাতে পারলাম না। আমি উঠে তাহাজ্জুদের নামায পড়লাম এবং মনে মনে ভাবলাম, কখন সকাল হবে আর কখন আমি মৌলভী সাহেবকে এ স্বপ্ন শুনাব। সকালে মৌলভী সাহেব যখন আসলেন তখন আমি নামায শেষ করে তাকে এই স্বপ্নটি শুনালাম, তিনি শুনে বললেন, তুমি খুবই সৌভাগ্যবান।

হযরত শেখ আসগর আলী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, তবলীগের সময় এভাবে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা অত্যন্ত ফলপ্রসূ, এশার নামাযের পর ঘুমানোর পূর্বে ওযূ করে দুই রাকাত নফল নামায পড়ে এভাবে দোয়া করা বাঞ্ছনীয়, হে আমাদের প্রভু! এ জামাত যদি সত্য হয় তবে আমাদের কাছে প্রকৃত সত্য প্রকাশ কর। তিনি বলেন, ১৯০০ ইং সালে চাকরী উপলক্ষে আফি"কা যাওয়ার সময় আমি আমার এক পুরোন বন্ধুকে আমার সেবক হিসেবে সাথে নিয়ে গিয়েছিলাম। তার নাম ছিল, নেক মুহাম্মদ সাহেব, আর তিনি গুজরাত জেলার সারায়ে আলমগীর নিবাসী ছিলেন। তবলীগ করার সময় আমি তাকে উপরে বর্ণিত ব্যবস্থা পত্রটি বলেছিলাম। কথামত তিনি এভাবেই অনুশীলন করেন এবং আল্লাহ্ তা'লা তাকে স্বপ্নেযোগে নিম্নবর্ণিত দৃশ্য দেখান। 'তিনি তার সারায়ে আলমগীরের বাড়িতে অবস্থান করছেন আর তার মরহুম পিতাও তার সাথে আছেন। তারা যে কক্ষে অবস্থান করছিলেন সেটি খুবই আলোকিত হয়ে গেছে আর দেখা যাচ্ছে, আকাশ থেকে একটি আলোর তরঙ্গ প্রবাহিত হচ্ছে যা কক্ষটিকে আলোকিত করছে এবং এরই সাথে সুদর্শন ও পবিত্র চেহারা বিশিষ্ট এক বুযূর্গ দৃশ্যপটে আসেন। আর নেক মুহাম্মদ সাহেবের সম্মানিত পিতা তার ছেলেকে সম্বোধন করে বলেন, ইনি ইমাম মাহদী। পরে পিতা পুত্র দু'জনই হুযূর (আ.)-এর সাথে সাক্ষাত করেন। এতো সুন্দর দৃশ্য দেখার পর তার ঘুম ভেঙ্গে যায়।' সকাল বেলা তিনি আমাকে এ অবস্থার কথা জানান এবং তার বয়আতের জন্য চিঠি লিখতে অনুরোধ করেন। ফলে আমি তার বয়আতের অনুরোধ করে চিঠি লিখে দেই। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তার পরিবারের

সবাই আহমদী।

উমর বখশ্ সাহেবের ছেলে হযরত মাস্টার মাওলা বখ্শ সাহেব (রা.) বলেন, তিনি পটিয়ালা রাজ্যের মাদরাসা সেঙ্গুহ্নীর হেড মাস্টার ছিলেন। ভাদ্রমাসে (আগষ্ট মাস যা বর্ষার পর আসে) মৌসুমী ছুটি হয়, তখন আমার হুযূর (আ.)-এর কাছে যাওয়ার ইচ্ছে হল। আমার ছেলে মরহুম আব্দুল গাফ্ফারের বয়স তখন দুই বছর ছিল। তার শরীরে ফোড়া উঠেছিল যা শুকোচ্ছিল না। আমি এর প্রতি কোন তোয়াক্কা না করে সেখান থেকে রওয়ানা দেই এবং সারহিন্দের মৌলভী মুহাম্মদ তাকী সাহেবকে সাথে নিয়ে হুযূর (আ.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে বয়আত করি। এখানে প্রায় এক মাস অবস্থান করে যখন আমি বাড়ি পৌঁছি তখন আমি আমার ছেলেকে পুরোপুরি সুস্থ্য দেখতে পাই। আমার স্ত্রী বলে, আমি একে গোসল করানো বন্ধ করে দিয়েছিলাম। এখন ফোড়াগুলো ভালো হয়ে গেছে।

হযরত কাযী মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব বলেন, ১৮৯৮ইং সালের দিকে আমি একটি সত্য স্বপ্নে দেখেছিলাম, 'আমি একটি উঁচু পাহাড়ের শৃঙ্গে পূর্ব দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছি। আমি আমার দু'হাত দুই দিকে যথা সম্ভব প্রসারিত করে রেখেছি। আমার ডান হাতের তালুতে সূর্যের সোনালী গোলক স্ফটিকের ন্যায় ঝলমল করছিল এবং বাম হাতের তালুতে রয়েছে চাঁদের গোলক যা (আমার হাত থেকে) তিন ফুট উঁচুতে রয়েছে। পূর্ব দিক থেকে একটি নদী পাহাড়ের দক্ষিণ পাশ ঘেষে বয়ে গেছে। নদী ও পাহাড়ের মাঝে একটি প্রশস্ত সবুজ শ্যামল মাঠ।' পরে এ স্বপ্নের যে ব্যাখ্যা বুঝলাম তাহল 'পাহাড় অর্থ মান-সম্মান লাভ, সূর্য অর্থ মুহাম্মদ (সা.) এবং চাঁদ অর্থ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), যিনি পূর্ণ চাঁদ ছিলেন। নদী অর্থ ঐশী জ্ঞান যা পূর্ব দিক আর তা পশ্চিমকে কল্যাণ মন্ডিত করবে। আর হাতের তিন ফুট উপরে চাঁদ থাকার অর্থ তিন বছর পর আহমদীয়াত গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করব। (তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন ১৮৯৮ইং সালে আর) ১৯০১ইং সালে আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন।

পাটিয়ালার সাবেক পুলিশ ইন্সপেক্টর হযরত শেখ মুহাম্মদ আফযাল সাহেব (রা.) বলেন, ১৯০০ইং সালের গ্রীস্মকাল, ডাক্তার হাশমতুল্লাহ্ সাহেব তখন একজন সেবকসহ বয়আত গ্রহণের উদ্দেশ্যে কাদিয়ান যান। মাগরিব নামাযের নিকটবর্তী সময় তিনি কাদিয়ান পৌঁছেন। কাদিয়ানের কাঁচা মেহমানখানায় বিছানাপত্র রেখে তিনি মসজিদে মুবারক-এ যান। হযরত মির্যা সাহেব মাগরিবের নামায পাড়ার জন্য বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসেন। তখন যেহেতু কিছুটা অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, তাঁকে বেশ মোটাসোটা মনে হল। আমি শহুরে আবহওয়ায় বড় হয়েছি শয়তান মনকে বিভ্রান্ত করল, যে মোটা হবে না কেন? নাউযুবিল্লাহ্। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্বন্ধে তার এমন মনে হয়েছে, অন্ধকারের ঠিকমত দেখা যাচ্ছিল না, শয়তান তার মনে ভ্রান্ত চিন্তাধারা সৃষ্টি করে যে, মোটা হবে না কেন, মানুষের মাংস তো আর কম খায় না! বাড়ির ভেতর থেকে অনেক মহিলার কথার আওয়াজ এলে মনের মাঝে পুনরায় কুধারণা সৃষ্টি হল, শয়তান বিভ্রান্ত করল, তাঁর চরিত্রেরই বা কী বিশ্বাস আছে? প্রবৃত্তির সাথে অনেক যুদ্ধ করি, সারা শরীর ঘর্মাক্ত হয়ে যায়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে প্রবৃত্তি নতুন নতুন নোংরা ধারণার উম্মেষ ঘটাচ্ছিল। আমি নামাযে দোয়া করলাম, হে আমার খোদা! এ ব্যক্তি যদি সত্যবাদী হয়ে থাকে তবে যেন আমি এখান থেকে অসফল ও ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে না যাই। কিন্তু মনে কোন শান্তি পেলাম না। নামাযের পর অতিথিশালায় ফিরে এলাম এবং এমন অবস্থায় বয়আত করা ঠিক হবে না বলে বয়আত না করার সিদ্ধান্ত নিলাম। এশার নামায পড়েছি কি পড়ি নি আর পড়লেও কোথায় পড়েছি তা মনে নেই। ব্যথিত হৃদয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। রাত দু'টো বা তিনটের দিকে এক ব্যক্তি আমাকে গলা ধরে খাটিয়ার উপর দাঁড় করিয়ে দিল। অর্থাৎ তিনি স্বপ্নে এ দৃশ্য দেখছেন। এতো জোরে গলা চেপে ধরেছে যে, আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত প্রায়। আর সে বলল, তুই জানিস না- মির্যা কে? ইনি হলেন সেই ব্যক্তি যিনি কখনো মিথ্যা কথা বলেন নি এবং নিজ দাবীর ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণ সত্যবাদী। সাবধান যদি অন্য কোন বাজে চিন্তা করিস! এরপর আমাকে ধাক্কা দিয়ে চৌকিতে ফেলে দিল। অত্যন্ত ভয়ঙ্কর স্বপ্ন ছিল। তিনি বলেন, ভীত-ত্রস্ত অবস্থায় আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তখন আমার চোখে অশ্রু ছিল এবং গলা খুব ব্যথা করছিল যেন আসলেই কেউ আমার গলা চেপে ধরেছিল, যদিও এসব কিছু স্বপ্নেই ঘটেছিল। মনকে বললাম, মির্যা সাহেবের সত্যতা সম্বন্ধে এখনো কোন সন্দেহ আছে কি? মন বলল, একদম নেই। সকালে মির্যা সাহেবকে দেখে বুঝলাম, যেন আকাশ হতে কোন ফিরিশ্তা নেমে এসেছেন অথচ তিনি সাধারণ গড়নেরই মানুষ ছিলেন। তাঁর আচার-ব্যবহারে প্রাণ উজাড় করতে ইচ্ছে করছিল। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যখন সামনে আসতেন তখন অবলীলায় কান্না পেত, যেন হুযূর প্রেমাস্পদ আর এই অধম প্রেমিক। আমি প্রসন্ন চিত্তে বয়আত করি। খোদা তা'লা আমাকে শয়তানের খপ্পর থেকে মুক্ত করে এক প্রকার বলপুর্বক মসীহ্র দ্বারে এনে দাঁড় করিয়েছেন। নতুবা আমি তো প্রায় পথ হারিয়েই বসেছিলাম।

হযরত কায়েম উদ্দীন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, আমি স্বপ্নে দেখি, 'আমার গ্রামের মসজিদে আমি নামায পড়ে উঠেছি, এমন সময় লোকেরা বলাবলি করছে, ভাইসব! এমন এক বিপদ এসেছে যা সারা পৃথিবীকে গ্রাস করবে। এ কথা শুনে আমারও মনে হল এটি আমাদের সবাইকে গ্রাস করে ফেলবে। কালো রঙের কাঠের মতন কি একটা যেন খেতজুড়ে দেখা যাচ্ছে। আমি লোকদের বললাম, নিশ্চয় এটি আমাদের গ্রাস করে ফেলবে। তোমরা কিছুটা হলেও আল্লাহ্কে স্মরণ কর! তখনই এগুলোর (অর্থাৎ বিপদগুলোর) দু' একটি আমার ডান হাতের আঙ্গুল ধরে ফেললে আমার মনে হল এটি আমাকে আর ছাড়বে না। আমি সেই কীটকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা কি খোদার পক্ষ থেকে এসেছ? কীটটি বলল, হ্যাঁ। আমি একে জিজ্ঞেস করলাম, মির্যা সাহেব সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী? সেটি বললো, তিনি সত্যবাদী। তুমি যদি মির্যা সাহেবকে না মান, তবে আমরা অবশ্যই তোমাকে খেয়ে ফেলব কারণ, তিনি সত্যবাদী। মির্যা সাহেব সত্যবাদী, এ বাক্যটি তিন বার উ"চারিত হল। এরপর আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়।' তিনি বলেন, আমি সকালে উঠে মাকে জিজ্ঞেস করলাম, জুমুআ কবে? তিনি বললেন পরশু। এরপর আমি

জুমুআর দিন গিয়ে হযরত সাহেবের হাতে বয়আত করি।

মিয়াঁ আমীর বখ্‌শ সাহেব (রা.)-এর পুত্র– হযরত আল্লাহ্ রাখ্‌খা সাহেব (রা.) বলেন। (তাঁরা দু'জনই সাহাবী ছিলেন)। আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে স্বপ্নে দেখেছি। এ স্বপ্নের সত্যাসত্য যাচাইয়ের জন্য আমি নারওয়াল নিবাসী মরহুম মৌলভী আহমদ দ্বীন সাহেব সহ কাদিয়ান আসি। মাসের নাম স্মরণ নেই তবে, গরমকাল ছিল। ফজরের নামাযের পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মসজিদে মুবারকে আসন গ্রহণ করেন। সে সময় নারওয়াল নিবাসী মরহুম মৌলভী আহমদ দ্বীন সাহেব তার তিনশব্দ বিশিষ্ট পংক্তির সমন্বয়ে রচিত কবিতা হতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে কিছু পড়ে শুনালেন। এতে তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দাবী এবং সে যুগের লোকদের বিরোধিতার কথা উল্লেখ করেছেন। মৌলভী সাহেব এতে একথাও উল্লেখ করেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.), মহানবী (সা.)-কে তার পিঠে বহন করে সওর গুহায় নিয়ে গিয়েছিলেন। একথা শুনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মৌলভী সাহেব! মহানবী (সা.)-কে হযরত আবু বকর (রা.) বহন করে নিয়ে যান নি বরং মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর সঙ্গে পায়ে হেঁটে গুহায় প্রবেশ করেছিলেন। এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে এটি ছাপানোর অনুমতি দেন এবং ভেতরে চলে যান।

হযরত মুহাম্মদ ফাযেল সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একদিকে বয়আত করার প্রতি আমার হৃদয়ে ছিল পরম ব্যাকুলতা আর অপর দিকে হযরত আকদাস (আ.)-এর আধ্যাত্মিকতা আমার হৃদয়ে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তা বর্ণনাতীত তাই হযরত মাখদুমুল মিল্লাত অর্থাৎ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর নিকট নিবেদন করলাম, [হুযূর (আ.)-এর নিকট] আমার বয়আত গ্রহণের জন্য আবেদন করুন। প্রতিদিন মাগরিবের নামাযের পর হযরত মাখদুমুল মিল্লাত আমার বয়আত গ্রহণের কথা হুযূর (আ.)-এর সমীপে উপস্থাপন করতেন, তিনি (আ.) বলতেন, আগামীকাল। এতে আমার বয়আত করার দুর্বার আকাড়খা এমন পর্যায়ে পৌছে যেত, তিনি একটি ফারসী পংক্তি পড়েন তাহল,

'ওয়াসল চুঁ শুওয়াদ নাযদীক - আতশে শওক তেজতার গারদাদ' অর্থাৎ প্রেমাস্পদের সাথে সাক্ষাতের সময় যত ঘনিয়ে আসে মিলন বা সাক্ষাতের অগ্নি ততই দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে। তিনি বলেন, এক সপ্তাহ পর আমার মন বলল, আমি তো স্বপ্নে বয়আত করেই ফেলেছি, তাই বিদায় না নিয়েই চলে আসলাম। অর্থাৎ কিছুদিন অতিবাহিত হবার পরও যখন বয়আতের আবেদন সৃহীত হয়নি তখন আমি ভাবলাম, আমি তো স্বপ্নে বয়আত করেই ফেলেছি, তাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছ থেকে অনুমতি না নিয়েই আমি নিজ শহরের বাড়িতে ফিরে আসি। তিনি বলেন, বাড়িতে এসে আমি ভীষণ অস্থির ও বিচলিত হয়ে পড়লাম। এক মাস পর আবার কাদিয়ানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। আমি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়ালের চিকিৎসালয়ে পৌছলে, তিনি আমাকে দেখে মুচকি হেসে বলেন, যে ব্যক্তি যুগ ইমামের অনুমতি না নিয়ে যায় তার অবস্থা এমনই হয়। তখন আমি বুঝতে পারলাম, যুগ ইমামের বিনা অনুমতিতে চলে যাওয়া সঙ্গত হয় নি। এরপর হযরত সাহেবের (আ.) সাথে সাক্ষাত করি কিন্তু বয়আত নেয়ার জন্য আমি আর পীড়াপীড়ি করি নি। আমার হৃদয় প্রশান্ত ও পরিতৃপ্ত হতে থাকে। অবশেষে বাইশ দিন পর বৃহস্পতিবার, মাগরিব নামাযের পর হুযূর (আ.) নিজেই বললেন, 'মুহাম্মদ ফাযেল বয়আত করে নাও।' আমি বয়আত করি আর এটি ১৮৯৯ সনের শেষ অথবা ১৯০০ সনের শুরুর দিকের ঘটনা ছিল।

হযরত মিয়াঁ গোলাম আহমদ বাফানদা সাহেব বর্ণনা করেন, আমি হানাফী ছিলাম পরে ওয়াহাবী হয়ে গেলাম কিন্তু শান্তি পাচ্ছিলাম না। মনে এই বাসনাই ছিল, আল্লাহ্ তা'লা হযরত ইমাম মাহদীকে আবির্ভূত করলে আমি তার সৈন্য দলে অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবো। একবার আমাকে স্বপ্নে হযরত আকদাস এর পবিত্র চেহারা দেখানো হয়। আমি কাদিয়ান গেলে তাঁর (আ.)-এর চেহারা হুবহু তেমনই (স্বপ্নেদেখা চেহারার মত) দেখতে পেলাম এবং বয়আত করে নিলাম।

হযরত হেকীম আব্দুর রহমান সাহেব (রা.) তার পিতার বয়আত গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা

করতে গিয়ে বলেন, আমাদের এখানে আলাউদ্দীন সাহেব নামে এক মৌলভী বসবাস করতেন। নিকটেই একটি মসজিদও ছিল। আমার পিতা তার কাছে পড়তেন। একদিন এশার নামাযের সময় আমার পিতা ওযু করতে করতে মৌলভী সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন, মৌলভী সাহেব! আজকাল অনেক বেশী উল্কাপাত ঘটছে। এর কারণ কি? উত্তরে মৌলভী সাহেব বলেন, ইমাম মাহদী আবির্ভূত হতে যাচ্ছেন। আকাশে তাঁর আগমন উৎসব উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। আমার পিতা বলেন, কয়েকদিন পর আমি হযরত আকদাস (আ.) সম্পর্কে জানতে পেরে কাদিয়ান গিয়ে বয়আত করি। ফিরে এসে মৌলভী সাহেবকে বললাম, আমি বয়আত করে এসেছি; আপনার কি ইচ্ছা? কিন্তু তিনি নিরব থাকেন। কিছুক্ষণ পর আস্তে করে বলেন, মিয়াঁ! কথা সঠিক কিন্তু আমি যে জগতপূজারী হয়ে গেছি। (হুযূর বলেন,) অর্থাৎ মৌলভীও আবার জগতপূজারীও!

হযরত মিয়াঁ রহীম বখ্‌শ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, যেদিন অমৃতসরে আব্দুল হক গযনবীর সাথে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মুবাহালা অনুষ্ঠিত হয় সেদিন আমার পিতাও সেই মুবাহালায় উপস্থিত ছিলেন। আমার পিতা বলতেন, হযরত সাহেব যে সময় দোয়া করছিলেন তখন হযরত মওলানা নূর উদ্দীন সাহেব জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। (হুযূর ব্যাখ্যা করে বলেন), তিনি এত আকুল হয়ে সকাতর চিত্তে দোয়া করেন যে, তা তার সহ্যের বাহিরে চলে যায় আর এ কারণে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমার পিতা বলেন, হযরত সাহেব (আ.)-কে দেখে আমার অন্তর সাক্ষ্য দেয়, তিনি এ জগতের মানুষ নন বরং তিনি একজন স্বর্গীয় মানুষ। আমার পিতা চভিন্ডায় ফিরে এসে স্বীয় গোত্রের লোকদের কাছে পুরো বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, সে এক অদ্ভূত জামাত, তারা সবাই ফিরিশ্‌তা তুল্য মানুষ। অতএব আমি, আমার পিতা, চাচা বরং বলা যায় আমাদের পুরো বংশ বয়আত করি।

হযরত চৌধুরী রহমত খাঁন সাহেব (রা.) তার বয়আতের ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, স্বপ্নে দেখলাম, 'আমি ঘর থেকে বেরিয়েই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে চৌধুরী মওলা বখ্‌শ ভাট্টি, চৌধুরী গোলাম হুসেন,

মৌলভী রহীম বখ্‌শ, মৌলভী শামসুদ্দীন,

কেবলমাত্র কুরআন শোনার জন্য যাচ্ছি। তিনি আমার এ কথা মানেন নি। পরের দিন আমি সুযোগ পেয়েই আহমদীয়া মসজিদে পৌঁছি। হযরত মরহুম মীর হামেদ শাহ্ সাহেব তখন দরস দিতেন। আমি যথারীতি প্রতিদিন উপস্থিত হতাম এবং ধর্মীয় জ্ঞানগর্ভ কথাবার্তা শুনতাম। আর যখন হযরত মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব কাদিয়ান থেকে এসে দরস দিতেন, তখন তাঁর প্রতাপের কারণে আমার অ-আহমদী শিক্ষকও দরসে উপস্থিত হতেন। যদিও আমাকে বিশেষ কোন তবলীগ করা হয়নি, কিন্তু দরস শুনতে শুনতে আমার সকল সন্দেহের নিরসন হয়। আমি বুঝে যাই, আহমদীয়া জামাতের উপর আরোপিত সকল অপবাদ ভিত্তিহীন। এরমধ্যে সত্যতার লেশমাত্র নেই। অবশেষে আমি হযরত আকদাসের বরাবরে বয়আতের আবেদনপত্র পাঠাই। কয়েকদিন পর আমার আবেদন সৃহীত হয়েছে এই মর্মে পত্র আসে আর আমার আহমদীয়াতের ক্রোড়ে স্থানলাভের সৌভাগ্য হয়। আমি নিয়ামতের স্মৃতিচারণস্বরূপ এটি উল্লেখ করতে চাই, খোদা তা'লা আমাকে সম্ভ্রান্ত বংশে সৃষ্টি করেছেন, ডাক্তারীর মতো বিখ্যাত পেশায় দক্ষতা লাভের সৌভাগ্য দিয়েছেন আর আমার অধিকাংশ দোয়া কবুল করেছেন, সকল আকাংখা পূর্ণ করেছেন, জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন, সন্তান-সন্ততি দান করেছেন। আর সবচেয়ে বড় যে পুরস্কার আমাকে দান করেছেন তাহল, আমি শেষ যুগে আগত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছি এবং আহমদী হবার গৌরব অর্জন করেছি। আগা সাহেবের কথাই সত্য হল। (তিনি বলেছিলেন, যেও না, গেলে মির্যায়ী হয়ে যাবে)। তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ যে, আমি সোজা পথে পরিচালিত হয়েছি।

এই কয়েকটি ঘটনা ছিল যা আমি বর্ণনা করলাম। এখন আমি ঐ বিষয়টিও বলতে চাই, জামাত যতই উন্নতি করছে, হিংসুক ও নৈরাজ্যবাদীদের কর্মকান্ডও ততই বেড়ে চলেছে। তারা বিভিন্নভাবে জামাতের ক্ষতি করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তারা কখনও চুপিসারে আক্রমন করে, কখনো প্রকাশ্যে, আবার কখনো শুভাকাংখী সেজে ক্ষতি করার চেষ্টা করে। এজন্য প্রত্যেক

আহমদীকে শত্রুদের সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য অনেক বেশি দোয়া করা উচিত। 'আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহীম ওয়া নাউজুবিকা মিন শুরুরিহিম' আর 'রাব্বি কুল্লু শাইয়িন খাদিমুকা রাব্বি ফাহ্‌ফাযনী ওয়ানসুরনী ওয়ারহামনী' দোয়া পড়া উচিত। শত্রুর মোকাবিলায় অবিচল থাকার দোয়া,

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ
أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

এবং দরূদ শরীফ অনেক বেশি পড়া উচিত, যাতে আমরা শত্রুদের সকল অনিষ্ট থেকে সুরক্ষিত থাকতে পারি।

গত কয়েকদিন হল, কোন নৈরাজ্যবাদী ফেসবুকে একদিকে হযরত বাবা নানক সাহেবের ছবি দিয়ে তাঁর বিপরীতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ছবি দেয়। আর অত্যন্ত নোংরা ও অশালীন মনমানসিকতার পরিচয় দিয়ে হযরত বাবা নানকের ছবির উপর অত্যন্ত বাজে ও নোংরা কথা লিখে এবং সেই সাথে ক্রস চিহ্ন এঁকে দেয়। অপরদিকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে প্রশংসাসূচক বাক্য লিখে (বাবা নানকের সাথে) তুলনা করেছে, তিনিই সত্য এবং তিনি এই তিনি সেই। এটি নিশ্চিত, সে একাজ মন্দ উদ্দেশ্যে এবং অশান্তি ও বিশ"ড়খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে করেছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রশংসা ও মর্যাদা বর্ণনা করা তার উদ্দেশ্য ছিল না বরং শিখ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত হানা তার উদ্দেশ্য ছিল। আর তার চেয়েও গুরুতর অন্যায় করেছে সেখানকার একটি পত্রিকা, যারা এটি ছেপে প্রকাশও করেছে। যারফলে কাদিয়ান এবং আশেপাশের এলাকাগুলোতে চরম উত্তেজনা দেখা দেয়। যাহোক, এটি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ, তাদের নেতৃবৃন্দ বিবেক ও ন্যায়নীতির জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে উত্তেজনা প্রশমিত করেছেন আর বলেছেন, আহমদীরা এমনটি করতে পারে না। অবশ্যই কোন দুস্কৃতকারী এবং অসৎ প্রকৃতির মানুষ আমাদের মাঝে সংঘর্ষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এমনটি করেছে।

আমার কাছেও কাদিয়ানের শিখ নেতাদের পক্ষ থেকে চিঠি এসেছে। চিঠিতে তারা বলেছে, আমরাও বিশ্বাস করি, কেউ ষড়যন্ত্রমূলকভাবে এমনটি করেছে আর দোষ পড়েছে আহমদীয়া জামাতের উপর।

অর্থাৎ এটি এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যেন কোন আহমদী তা লিখেছে এবং আহমদীয়া জামাত এটি ছাপিয়েছে। অথচ জামাতে আহমদীয়া কখনোই এমন ন্যক্কারজনক আচরণ করতে পারে না।

যাহোক, ঐসব সম্মানিত ব্যক্তি, তাদের বিভিন্ন সংগঠন এবং আহমদীয়া জামাত সরকারের কাছে দাবী করে যে, বিষয়টির সুষ্ঠু তদন্ত করে অপরাধীকে কঠিন শাস্তি দেয়া হোক। কারো ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতিতে আঘাত করা যাবে না, এটি জামাতে আহমদীয়ার স্থায়ী অবস্থান। ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের বিষয় তো অনেক বড় কথা, আমরাতো পবিত্র কুরআনের এই শিক্ষার এর উপর প্রতিষ্ঠিত, "অন্যদের মূর্তি-প্রতিমাকেও গালমন্দ করবে না।" বাবা নানক সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) স্পষ্টভাবে প্রশংসাসূচক কথা বলেছেন। আহমদীয়া জামাতের বই-পুস্তকে তাঁর মর্যাদা এবং সম্মান সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। কোন খাঁটি আহমদী তাঁর সম্পর্কে এমন নীচ, নোংরা এবং কদর্যপূর্ণ কথা বলার বিষয়টি ভাবতেও পারে না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বাবা নানক সাহেব সম্পর্কে একস্থানে বলেন, 'খোদা তা'লা বাবা নানক সাহেবকে সে সময় সত্য এবং সত্যান্বেষণের প্রেরণা দান করেছেন, যখন পাঞ্জাবে আধ্যাত্মিকতা কমে গিয়েছিল। এথেকে প্রমাণিত হয়, নিঃসন্দেহে তিনি এমন তত্ত্বজ্ঞানীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন যারা ভেতরে ভেতরে এক খোদার প্রতি আকৃষ্ট হয়।'

অপর একস্থানে তিনি (আ.) বলেন, 'প্রত্যেক মু'মিন ও মুত্তাকী ব্যক্তির জন্য আবশ্যক হচ্ছে, তাঁকে (অর্থাৎ হযরত বাবা নানক সাহেবকে) সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা এবং তাঁকে পবিত্র লোকদের মাঝে অন্তর্ভূক্ত মনে করা। আমাদের মানতে হবে, আমরা যে কাজে নিয়োজিত আছি– বাবা সাহেব সেই প্রকৃত জ্যোতি প্রসারের ক্ষেত্রে যে সাহায্য করেছেন এর জন্য যদি তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করি তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা অকৃতজ্ঞ সাব্যস্ত হব।'

অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর নিজের কাজ এবং হযরত বাবা নানক সাহেবের কাজকে একই প্রকৃতির বলে আখ্যা দিয়েছেন। কাজেই সেসব ব্যক্তি চরম দুর্ভাগা যারা বাবা নানক সম্পর্কে

অপলাপ করে।

তিনি (আ.) আরেক স্থানে বলেন, 'আমাদের ন্যায়নিষ্ঠবোধ আমাদের একথা স্বীকার করতে বাধ্য করে যে, নিঃসন্দেহে বাবা নানক সাহেব সেসব প্রিয় বান্দার অন্তর্ভূক্ত ছিলেন যাদেরকে খোদা তা'লা স্বহস্তে নূরের দিকে আকৃষ্ট করেছেন।'

তিনি (আ.) অন্যত্র বলেন, 'আমি শিখ সাহেবদের সাথে এ বিষয় একমত, বাবা নানক সাহেব প্রকৃত পক্ষে খোদা তা'লার প্রিয়পাত্রদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।'

তিনি (আ.) বলেছেন, 'এখন জামাতের পক্ষ থেকে এ ঘোষণা মুদ্রিতও হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে বাবা নানক সাহেব খোদার প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত। তিনি তাঁদের অন্তর্ভূক্ত যাদের প্রতি ঐশী কল্যাণ অবতীর্ণ হয় এবং যারা খোদা তা'লার হাতে পবিত্র হন। আমি সেসব লোককে দুস্কৃতকারী ও নীচ জ্ঞান করি যারা এমন কল্যাণমন্ডিত লোকদের কথা বলতে গিয়ে অবমাননাকর ও অপবিত্র ভাষা ব্যবহার করে। মহারাজা রামচন্দ্র ও মহারাজা কৃষ্ণ'রা খোদা তা'লার পক্ষ থেকে প্রেরিত প্রবিত্র ব্যক্তিত্ব ছিলেন।'

অতএব, যে-ই এ ঘোষণা প্রকাশ করেছে বা এ চিত্র বানিয়েছে, সে দুস্কৃতি ও নৈরাজ্য ছড়ানোর উদ্দেশ্যে এসব করেছে। কাদিয়ানের ব্যবস্থাপনা পত্র-পত্রিকায় এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ছাপিয়েছে আর এটিই বাস্তব অবস্থান। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতি সমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আমাদের নিকট বাবা নানকের মর্যাদা অতীব মহান এবং আমরা তাকে খুব সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখি। আল্লাহ্ তা'লা সর্ব প্রকার বিশ"ড়খলা ও দূরভিসন্ধি থেকে কাদিয়ানের আহমদীদের এবং সেখানকার পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখুন এবং শত্রুরা তাদের দুস্কৃতিমূলক কর্মকান্ডে ব্যর্থ ও বিফল হোক।

এখন আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করব এবং জুমুআর নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা পড়াব। প্রথম জানাযা হচ্ছে, মোকাররম আব্দুর রাজ্জাক বাট সাহেবের যিনি ২০১২ সালের ৬ অক্টোবর ৬৫ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেছেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

তিনি যুগপৎ জামাতের মুবাল্লেগ ও মূসী ছিলেন। তার জানাযার নামায সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আঙ্গিনায় পড়া হয়েছে। কোন ঔষধের ভুল প্রয়োগে তার হৃৎপিন্ড প্রভাবিত হয় আর তিনি মৃত্যু বরণ করেন। নয়তো আল্লাহ্‌র কৃপায় তিনি বেশ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। তার পিতার নাম ছিল গোলাম মোহাম্মদ কাশ্মীরী এবং তিনি গুজরাটের অধিবাসী ছিলেন। শৈশব থেকেই তার পিতা নামাযে অভ্যস্থ ছিলেন, এ কারণে নিজ অঞ্চলে মৌলভী নামে অভিহিত হতেন। তিনি ১৯৩০ সালে বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি যখন বয়আত গ্রহণ করেন তখন তার স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে যায়। তখন তার স্ত্রীকে তার এক অ-আহমদী বান্ধবী জিজ্ঞেস করেন, তিনি কি আহমদী হয়ে নামায পড়া ত্যাগ করেছেন? তখন তার স্ত্রী অর্থাৎ রাজ্জাক বাট সাহেবের মা তাকে বলেন, না, নামায তো পূর্বের চেয়ে আরো বেশি পড়েন। তখন তার বান্ধবী বলেন, তবে তিনি কাফির কীভাবে হলেন? এরপর তিনি (রাজ্জাক সাহেবের মা) ফেরত চলে আসেন। তিনিও খুবই পুণ্যবতী নারী ছিলেন।

আব্দুর রাজ্জাক বাট সাহেব গুজরাটের আলমগড় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। এরপর ১৯৭১ সালে জামেয়ার পড়ালিখা সমাপ্ত করেন এবং মুরুব্বী সিলসিলাহ্ হিসেবে পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে সেবা প্রদান করেন। এরপর ১৯৭৫ সালে ঘানায় দায়িত্বে নিযুক্ত হন। সেখানে তিনি বিভিন্ন স্থানে থাকেন। এরপর ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত আহমদীয়া মিশনারী ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপাল হিসেবে সেবা প্রদানের সৌভাগ্য লাভ করেন। এরপর ১৯৮৯ সালে পাকিস্তান ফিরে আসেন। এরপর পাকিস্তানেই মুরুব্বী হিসাবে দয়িত্ব পালন করেন। কেন্দ্রীয় ইসলাহ্ ও ইরশাদ বিভাগের অধীনে তরবীয়ত নওমোবাঈন-এ সেবা প্রদান করতে থাকেন। ইসলাহী কমিটির সদস্য ছিলেন। এখানেও তিনি ব্যাপক সফলতা লাভ করেন। তাঁর কথা বলার ধরন ও বোঝানোর পদ্ধতি খুব চমৎকার ছিল। নুসরত জাঁহার সেক্রেটারী মোবারক তাহের সাহেব, যিনি তাঁর স্ত্রীর ভাই, লিখেছেন, যখন আমার বোন স্নেহের আমাতুন্ নূর তাহেরের জন্য বাট সাহেবের বিয়ের প্রস্তাব

আসল তখন আমার পিতা হযরত মওলানা মোহাম্মদ মনোয়ার সাহেব তখনকার সেক্রেটারী হাদীকাতুল মুবাশ্বেরীন মওলানা শেখ মুবারক আহমদ সাহেবের সাথে পরামর্শ করেন যে বলুন, কর্মক্ষেত্রে বাট সাহেবের কাজ কেমন? শেখ সাহেব বলেন, তিনি খুব ভাল কাজ করছেন। তার রিপোর্ট খুব ভাল ও সন্তোষজনক। এ রিপোর্ট শুনেই আব্বাজান বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। ফিল্ডে তার কাজ আমি দেখেছি, ঘানাতে আমি তার সাথে ছিলাম, তিনি যেমন নিঃস্বার্থভাবে কাজ করেছেন খুব কম মুবাল্লেগ-ই এভাবে কাজ করেন। স্ত্রী-সন্তানদের সাথে তার একান্ত বন্ধুসুলভ সম্পর্ক ছিল। প্রত্যেক জুমুআতে সব মেয়েদের দাওয়াত দিতেন এবং সবাইকে সাথে নিয়ে জুমআর খুতবা শুনতেন। তিনি তার মায়ের খুব সেবা করেছেন। তিনি তার প্রতিটি সাফল্যের কৃতিত্ব সর্বদা মাকে দিতেন। সর্বদা নিজের সন্তানদেরকে নামায ও দোয়ার বিষয় তাগাদা দিয়ে যেতেন। যে সন্তানরা নামাযী ছিলেন, তাদের সাথে খুবই ভালবাসাপূর্ণ ব্যবহার করতেন সন্তোষ প্রকাশ করতেন। তার পাঁচ-ছয় জন মেয়ে ছিল। যখন তার সন্তানদের জন্য বিয়ের প্রস্তাব আসত, আর এই প্রস্তাব সম্পর্কে কেউ জানতে চাইলে তিনি সর্বদা এ উত্তরই দিতেন, "ছেলে নামায পড়ে এবং চাঁদা দেয়, তোমাদের আর কি চাই?" আর একথাও বলতেন, "যদি আমার মেয়ের ভাগ্যে থাকে তবে খালি ঘরও ভরে দেবে আর যদি ভাগ্যে না থাকে তবে অনেক এমন মেয়েও আছে যারা ভরা ঘরকে খালি করে দেয়।" এতে সাধারণত সেসব লোকের জন্যও শিক্ষা রয়েছে যারা প্রয়োজনের তুলনায় জাগতিক বিষয়কে বেশী প্রাধান্য দিয়ে থাকে। তিনি খিলাফতের সাথে গভীর সম্পর্ক রাখতেন। তার ছেলের কোন কারণে শাস্তি হয় এবং যতদিন পর্যন্ত সে ক্ষমা পায় নি তার সাথে তিনি কথা বলেন নি এবং বলতেন, "যখন যুগ খলীফা তার প্রতি অসন্তুষ্ট তখন আমি তার সাথে কীভাবে সম্পর্ক রাখতে পারি?" ২০০৯ সালে যুক্তরাজ্যে এসেছিলেন। তার ছেলেকে যে শাস্তি দেয়া হয়েছিল তিনি আমার কাছে এর উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি। কখনো ঘুণাক্ষরেও এ ব্যাপারে উল্লেখ করেন নি যে, তাকে ক্ষমা করে দিন। অথবা কোনটা ঠিক বা কোনটা ঠিক নয় (এমন কথাও উঠান নি)। কেবল একথাই

বলেছেন, "দোয়া করুন আল্লাহ্ তা'লা যেন তাকে সুবুদ্ধি দান করেন।" সর্বদা জামাতের ব্যবস্থাপনা এবং খিলাফতের প্রতি আনুগত্যশীল ছিলেন এবং সন্তানদেরকেও এর উপদেশ দিয়ে গেছেন। নিয়মিত খুতবা শুনতেন আর যেভাবে আমি বলেছি, কোন সন্তান খুতবার মাঝে উ"চবাচ্য করলে খুবই অপছন্দ করতেন। অসুস্থাবস্থায়ও সাধারণত ছুটি নিতেন না। যদি কেউ ছুটির ব্যাপারে বলত তবে তিনি বলতেন, "অফিসে গেলেই সুস্থ হয়ে যাব।" ছুটি আছে তাই ঘুরতে নিয়ে যান সন্তানেরা কখনো এই মর্মে আবদার করলে বলতেন, আমার জীবন জামাতের জন্য উৎসর্গ করা। আর নিশ্চিত এ বাক্যটি বুলি স্বর্বস্ব ছিল না। তিনি প্রত্যেক মুহূর্ত জামাতের সেবার জন্য উৎসর্গ করেছিলেন এবং তা পালন করে দেখিয়েছেন।

যেভাবে আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি, আফি"কাতে আমি তার সাথে ছিলাম। তখনকার অবস্থাও বর্তমান অবস্থার অনেক তফাত রয়েছে। অতি সংকটময় অবস্থা ছিল তাসত্ত্বেও খুবই উৎফুল চিত্তে তিনি সেখানে দিন কাটিয়েছেন। অধিকাংশ সময় অসুস্থ হয়ে পড়তেন, ম্যালেরিয়া হয়ে যেত। হাসপাতালে ভর্তি হতেন, কিন্তু যখনই সুস্থ হতেন কালবিলম্ব না করে কাজে যোগ দিতেন। স্থানীয়দের প্রতি ভালবাসার (আচরণের) কারণে মানুষ তাকে খুবই পছন্দ করত। আমি যখন সেখানে গিয়েছি, তিনি মুবাল্লেগ হিসেবে কাজ করছিলেন। তিনি স্থানীয় পরিস্থিতি সহ আরো অনেক বিষয় আমাকে অবহিত করেছেন এবং বুঝিয়েছেন। এভাবে আমাকে প্রয়োজনীয় সকল দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি স্নেহ ও ক্ষমার আচরণ করুন। তার প্রতি রহমত এবং বরকত অবতীর্ণ করুন। নিজ প্রিয়দের মাঝে তাকে স্থান দিন। তাঁর স্ত্রী এবং সন্তানদেরকেও ধৈর্য এবং দৃঢ় মনোবল দিন। তাঁর এক ছেলে জামাতের মুবাল্লেগ হিসেবে সিয়েরালিওনে কর্মরত আছেন আর তাঁর স্ত্রীও সেখানে। তিনি জানাযায় অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে ধৈর্য ধরার শক্তি দিন।

আমি এ এখন দ্বিতীয় যে জানাযা পড়াবো তাহল, শ্রদ্ধেয়া ডা. ফাহমিদা মুনীর

সাহেবার। ২০১২ সালের ৮ অক্টোবর ৭৫ বছর বয়সে তিনি কানাডায় মৃত্যুবরণ করেছেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

১৯৬৪ সালে তিনি লাহোরের ফাতেমা জিন্নাহ্ মেডিকেল কলেজ থেকে গইইঝ পাশ করেছেন। হাউস জব করার পর উন্নতির যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও রাবওয়ার ফযলে ওমর হাসপাতালে গাইনি বিভাগে ডাক্তারের প্রয়োজন দেখা দিলে তিনি ১৯৬৫ সাল থেকে ফযলে ওমর হাসপাতালে যোগদান করেন। তিনি দীর্ঘদিন সেবা দান করেছেন। তার সেবার ঘটনা পড়তে গেলে সম্ভবত একটি খুতবার পুরো সময় দরকার হবে বরং বেশি সময় লাগতে পারে। ১৯৬৪ সালে লাহোরের এচিসান হাসপাতালে হাউস জব করছিলেন। ইতোমধ্যে ইংল্যান্ডে চাকরির উদ্দেশ্যে আবেদন করেছিলেন আর নিযুক্তি পত্রও হস্তগত হয়। টিকিটের ব্যবস্থাও হয়ে গিয়েছিল। ইংল্যান্ড যাত্রার পুরো প্রস্থতি সম্পন্ন করেন। পরবর্তী দিন যখন ঘরে 'আল্ ফযল' পত্রিকা আসে, তাতে রাবওয়ার ফযলে ওমর হাসপাতালে মহিলা ডাক্তার প্রয়োজন বলে বিজ্ঞাপন দেখতে পেলেন। এর সাথে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর বার্তা দেখেন, "ফযলে ওমর হাসপাতালে যদি কোন আহমদী মহিলা ডাক্তার না আসে তবে কোন খ্রিস্টান মহিলা ডাক্তার নিয়োগ করার ব্যবস্থা নিন।"

দশজন ভাই-বোনের বড় পরিবারের আর্থিক অস্বচ্ছলতা সত্ত্বেও তিনি লন্ডন যাবার পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। তার বাবা সেকশন অফিসার ছিলেন তাসত্ত্বেও আর্থিক দৈন্যতা ছিল। তার বাবা ঋণ করে তাকে গইইঝ কোর্স সম্পন্ন করান। এরূপ পরিস্থিতি সত্ত্বেও তিনি সে দিনগুলোতে লাহোর থেকে রাবওয়া যাওয়ার জন্য প্রস্থতি নিতে শুরু করেন। যে হাসপাতালে হাউস জব করতেন সেখানকার কর্মকর্তার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন। এম এস তাকে জিজ্ঞেস করেন, কেন চলে যাচ্ছ? সেখানে কত টাকা বেতন পাবে? ডা. ফাহমিদা সাহেবা বলেন, হয়ত মাসিক ২৩০ টাকা বেতন পাব। এম এস সাহেব বলেন, আমি তোমাকে সাড়ে পাঁচশত টাকা বেতন দেয়ার ব্যবস্থা করছি তবুও লাহোর ছেড়ে যেও না। তোমার ভবিষ্যত এই হাউস জবের সাথে সম্প"ক্ত। কিন্তু তিনি এ প্রস্তাবও গ্রহণ করেন নি বরং বলেন, আমি অর্থের লোভে যাচ্ছি না কেননা আমার জন্য ইংল্যান্ডেও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা আছে আবার টিকেটও কাটা আছে, তাছাড়া সেখানে ভর্তির কার্যক্রমও সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু অমি এসব কিছু ছেড়ে রাবওয়া যাচ্ছি। এর প্রতি উত্তরে এম এস বললেন, আপনি অনেক মহান মহিলা, যে নিজের জামাতের জন্য ভবিষ্যতকে হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। এম এস তাকে তার সর্বোত্তম হাউস জবের এসিস্ট্যান্ট হিসেবে সনদ প্রদান করেন। এরপর তিনি ১৯৬৪ সালে রাবওয়া চলে আসেন এবং ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত ফযলে ওমর হাসপাতালে মহিলা ডাক্তার হিসেবে সেবা করার সুযোগ পান। তৎকালীন সময় রাবওয়ায় এবং এর আশেপাশেও কোন মহিলা ডাক্তার ছিল না । একটি বিশাল অঞ্চলজুড়ে তাকে একা দায়িত্ব পালন করতে হত। শীত হোক বা গ্রীষ্ম, রাত দু'টা বা তিনটা যখনই কোন রোগী আসত তিনি দ্রুত বিছানা ছেড়ে রোগী দেখতেন। তার ব্যাপারে এটিও জানা যায় যে, তিনি ওলিমার দিন বধুবেশে স্টেজে বসে ছিলেন তখন হাসপাতাল থেকে অতীব জরুরী সংবাদ আসে! তখন তিনি সেই পোশাকেই সেখান থেকে উঠে হাসপাতালে চলে যান। নিমন্ত্রিত অতিথিরা তার অনুপস্থিতিতেই খাবার খান।

যাহোক, এই ছিল তার ত্যাগের বৈশিষ্ট্য, তিনি ওয়াকফের প্রেরণার সমৃদ্ধ হয়ে সেবায় ব্রতী হয়েছেন। আল্লাহ্ সকল ওয়াকেফীনকে এ দৃষ্টান্ত অনুকরণের সৌভাগ্য দান করুন। গরীবদের প্রাণখুলে সাহায্য করতেন। বিনামূল্যে তাদেরকে চিকিৎসা সেবা দিতেন। সেই অঞ্চলের রীতি হল, লোকেরা নিজেদের সমস্যা বলতে গিয়ে মিথ্যার আশ্রয় নিত। কিন্তু তিনি কখনো এ ধরনের কথা বলেন নি, সে মিথ্যাবাদী নাকি সত্যবাদী– তা তদন্ত করব। যে যাই বলেছে চোখ বুজে বিশ্বাস করে বিনামূল্যে চিকিৎসাও করতেন আবার ঔষধও দিয়ে দিতেন। তার স্বামী বর্ণনা করেন, অনেকবার এমনও হয়েছে, তিনি হাসপাতালে রাত কাটাতেন এবং সকালে স্বামীর কাজে যাবার সময় তিনি হাসপাতাল থেকে ফেরত আসতেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) শূরায় পর্দার ব্যাপারে তার উদাহরণ দিয়েছেন। যদি

কেউ পর্দার ভেতরে থেকে কাজ করতে চায় তাহলে ডাক্তার ফাহমিদার কাছ থেকে শিখুন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (আহে.) বলেন, খুবই ত্যাগী মনমানসিকতার অধিকারীনি মহিলা আর খুব কম মানুষই এরূপ যোগ্যতা লাভ করতে পারে। ১৯৬৪ সালে হাসপাতালে যোগদানের পর তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর সাথে সাক্ষাত করতে যান, হযরত আপা উম্মে মতীনও সেখানে ছিলেন। তিনি বলেন, ফযলে ওমর হাসপাতালের মহিলা ডাক্তার এসেছেন শুনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) দ্রুত আলহামদুলিল্লাহ্ বলে তার জন্য অনেক দোয়া করেন। একবার তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর সাথে সাক্ষাতের সময় বলেন, আমি এত্বেকাফে বসতে চাই; উত্তরে হুযূর বলেন, আমার রোগী দেখ– আর আমি তোমার জন্য অনেক দোয়া করব। এটিই তোমার এত্বেকাফ।

খিলাফতের সাথে তার খুবই আন্তরিক সম্পর্ক ছিল এবং অত্যন্ত সাহসী মহিলা ছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তার রচিত কবিতা খুবই পছন্দ করতেন। কেবল ডাক্তারই ছিলেন না বরং অনেক বড় মাপের কবিও ছিলেন। তার কবিতা ছিল কৃত্রিমতামুক্ত এর সাথে পূর্ণতা আর আবেগও ছিল। তার সাতটি কবিতার সংকলন ছেপে প্রকাশিত হয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) হিজরতের পরে এখানে এলে তিনি একটি কবিতা লিখে পাঠান। আর এর একটি পঙক্তি ছিল, "দীর্ঘ দিন ধরে ঘরে তালা ঝুলছে, তাঁকে বলে দাও সে যেন নিজের ঘরে ফিরে আসে।" হুযূর (রাহে.) এই পঙক্তির জন্য তাকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেছিলেন, দাদীমার ন্যায় ডাক্তার ফাহমিদার এই শাসন আমার খুব ভাল লেগেছে। সর্বদা তিনি নিজের সন্তান ও ভাই-বোনদের উপদেশ দিতেন, যদি পৃথিবীতে সম্মান পেতে চাও তাহলে খিলাফতের সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক রাখ আর নিজের অস্তিত্বকে এ পথে বিলীন করে দাও।

ডাক্তার নুসরাত জাহান সাহেবা যিনি বর্তমানে হাসপাতালের ডাক্তার, ফযলে ওমর হাসপাতালের ইনচার্জ, তিনি বলেন, ডা. ফাহমীদা খুবই ধৈর্যশীলা ও উত্তম গুণাবলীর অধিকারীনি ডাক্তার ছিলেন। তখন প্রতিকূল অবস্থা ছিল আর সুযোগ-সুবিধাও ছিল অপ্রতুল। কিন্তু গভীর একাগ্রতা ও পরিশ্রমের সাথে কাজ

করেছেন। নিজের কাজে খুবই দক্ষতা ছিল তার। রোগীদের সাথে একান্ত স্নেহসূলভ ও ভালবাসাপূর্ণ ব্যবহার করতেন। রোগীরা আজও তাকে স্মরণ করেন। বর্তমানে ডাক্তার নুসরাত জাহান সেখানে রয়েছেন তিনিও আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ওয়াকফের চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে কাজ করছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে সুস্বাস্থ্য ও কর্মক্ষম দীর্ঘায়ু দান করুন এবং ফযলে ওমর হাসপাতালে ডাক্তারের যে ঘাটতি রয়েছে তাও দূর করুন। সেখানে যে গুটিকতক ডাক্তার আছেন তাদের হাতে রোগীদের আরোগ্য নিশ্চিত করুন । তাদের দৃঢ় মনোবল এবং সাহস দান করুন। ডাক্তার নুসরাত জাহান সাহেবাও দোয়া পাবার অধিকার রাখেন। একবার সেখানে একটি নযম লিখার প্রতিযোগিতা হয়। এতে নাম ঠিকানাও লিখতে বলা হয়। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন, এটিই তার বৈশিষ্ট্য। কবিতার শেষে তিনি নাম ঠিকানার স্থানে লিখেন, 'সৃষ্টির সেবা, লেখালেখী, ঘরের দেখাশুনা (হাউজ ওয়াইফ) শুভ পরিণতির জন্য দোয়া প্রার্থী।' এটি কেবল কথার কথা নয় যেমন কিনা আমি বলেছি, নিঃস্বার্থ মহিলা ছিলেন, এবং তিনি নিঃস্বার্থ সেবা করেছেন। এ লেখায় তিনি নিজের জীবনের সারাংশ তুলে ধরেছেন।

সত্যিই তিনি সৃষ্টির সেবিকা ছিলেন এবং পারিবারিক দায়িত্ব পালনকারীনি ছিলেন। আত্মবিশ্লেষণ করতেন। তিনি মানব হিতৈষী ছিলেন। আমি মনে করি, তার পরিণতিও উত্তমই হয়েছে। কেননা হাদীস অনুযায়ী মানুষ যদি কারো প্রশংসা করে তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায় আর তিনিও ঐসব মানুষের একজন ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার সন্তানদেরকে মায়ের পুণ্য কর্মসমূহকে তাদের নিজ নিজ জীবনে রূপায়ন ও চলমান রাখার সামর্থ দান করুন। তার স্বামীকে ধৈর্য, দৃঢ় মনোবল ও সাহস দিন।

তৃতীয় জানাযা যা জুমুআর নামাযের পর পড়ানো হবে তা হচ্ছে, মোকাররমা নাসীরা বিনতে যারিফ সাহেবার যিনি হায়দ্রাবাদের শহীদ ডাক্তার আকীল বিন আব্দুল কাদের সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। নরওয়েতে বসবাস করতেন। তিনি গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ সালে ইন্তেকাল করেন,

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

তার মা ফাতিমা জামিলা সাহেবা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর স্ত্রী হযরত সাইয়্যেদা সারাহ্ বেগম সাহেবার ফুফাত বোন ছিলেন। তার পিতা জনাব মুহাম্মদ যারিফ সাহেব মরহুমকে আল্লাহ্ তা'লা তের বছর বয়সে আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য দান করেছিলেন। এ কারণে তাকে খুব অল্প বয়সেই বিভিন্ন সমস্যা ও বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। মরহুমার বিবাহ ১৯৪৯ সালে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত প্রফেসর আব্দুল কাদের সাহেবের ছেলে মোকাররম ডাক্তার আকীল বিন আব্দুল কাদের সাহেবের সাথে সম্পন্ন হয়। খুবই অতিথিপরায়ণ মহিলা ছিলেন। স্বামী ডাক্তার আকীল বিন আব্দুল কাদের সাহেবের নিকট আগত অসংখ্য অতিথি ও আত্মীয়-স্বজনকে তিনি মন-প্রাণ দিয়ে সেবা করতেন। নামাযী, তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত, উত্তম স্বভাববিশিষ্ট, গরীবদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং জ্ঞানপিপাসু মহিলা ছিলেন। এ পরিবারও জ্ঞানপিপাসু, মাশাআল্লাহ্। অভাবীদের অভাব মোচন ও তাদের সাহায্য করার চেষ্টায় রত থাকতেন, যেন তাদেরকে মানুষের কাছে অভাবের কথা বলতে না হয়। তিনি যে কোন কাজ শিখার আগ্রহ রাখতেন। তিনি সাহিত্য বিষয়ক পরীক্ষায় পাশ করেছেন। সন্তানদেরকেও উত্তম শিক্ষা দানের চেষ্টা করেছেন। ১৯৮৫ সালে স্বামীর শাহাদতের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে তাকে ১৯৮৭ সালে নরওয়েতে হিজরত করতে হয়। যদিও তার বয়স ষাট বছর ছিল এবং উ"চ রক্তচাপের রোগী ছিলেন কিন্তু তাসত্ত্বেও নরওয়ের ভাষা শেখার চেষ্টা করেছেন। জামাত ও খিলাফতের সাথে খুবই আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর গ্রন্থাদি ও জামাতের পুস্তক-পুস্তিকা সর্বদা তিনি অধ্যয়ন করতেন। যথাসময় চাঁদা প্রদানের বিষয় সর্বদা সচেতন থাকতেন। তার দুই ছেলে ডাক্তার। একজন মেয়েও রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার সন্তানদেরকেও তার উত্তম গুণাবলী ধরে রাখার তৌফিক দিন এবং তার পদমর্যাদা বৃদ্ধি করুন। (আমীন)

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)

ঋণ সম্পর্কিত ইসলামী শিক্ষা

আলহাজ্জ মাওলানা সালেহ্ আহমদ
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

আজকের সমাজে আর্থিক লেনদেন এবং এর মধ্যে ঋণ হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পূর্ববর্ত্তী সভ্যতাগুলোতেও এ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আর্থিক লেন দেন একটি সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা এবং সে সমাজের চারিত্রিক ও নৈতিক বৈশিষ্ঠাবলীর চিত্র তুলে ধরে। ইসলামের পূর্বে আরবদের মাঝে ও অন্যান্য জাতিগুলিতে, আর্থিক লেনদেন এবং ঋণ সংক্রান্ত বিষয়াদিতে মানুষের চরম অধঃপতন ঘটেছিল। লেনদেনের বিষয়ের সাথে যেহেতু নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাই পবিত্র কুরআন আমাদেরকে এ বিষয়ে বিষদভাবে শিক্ষা দিয়েছে।

পবিত্র কুরআন বলে, "হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন একে অন্যের সাথে নির্দিষ্টকালের জন্য ঋণের লেনদেন কর তখন তা লিখে নাও। আর তোমাদের মাঝে একজন লেখক যেন (চুক্তিনামাটি) ন্যায্যভাবে লিখে দেয় এবং কোন লেখক যেন লিখতে অস্বীকার না করে, কারণ আল্লাহ্ তাকে (লিখতে) শিখিয়েছেন। অতএব সে যেন লিখে। আর যার ওপর (ঋণ শোধের) দায়িত্ব সে যেন চুক্তিটি লিখানোর (সময়) তার প্রভূ প্রতিপালক আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করে এবং তা (লিখতে) যেন সে কিছুই কম না করে। কিন্তু যার ওপর (ঋণ শোধের) দায়িত্ব সে যদি নির্বোধ বা দূর্বল হয় অথবা সে লিখিয়ে নিতে অসমর্থ হয় তাহলে তার প্রতিনিধি যেন ন্যায্যভাবে (তা) লিখিয়ে নেয় এবং তোমাদের পুরুষদের দুজনকে সাক্ষী রাখে। কিন্তু দুজন পুরুষ পাওয়া না গেলে (উপস্থিত) লোকদের মাঝ থেকে যাদের তোমরা পছন্দ কর (তাদের) একজন পুরুষ ও দুজন নারী (সাক্ষী রাখ)। (দুজন নারী সাক্ষী রাখার) কারণ হলো, দুজনের একজন ভুলে গেলে এদের একজন যেন অপরজনকে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং সাক্ষ্য দিতে তলব করা হলে সাক্ষীরা যেন অস্বীকার না করে। আর (লেনদেন) ছোট হোক বা বড় হোক তোমরা তা (পরিশোধের) মেয়াদসহ লিখতে শৈথিল্য দেখাবে না। এ (বিষয়টি) আল্লাহ্‌র কাছে অধিক ন্যায়সঙ্গত এবং এটাই সাক্ষ্যকে আরো বেশি জোরালো করে। এ ছাড়া তোমাদের সন্দেহে না পড়ার এটাই সহজ পন্থা। তবে নগদ ব্যাবসায়ে তোমরা যা পরস্পর লেনদেন করে থাক তা তোমরা না লিখলে (তোমাদের) কোন পাপ হবে না। আর যখন তোমরা নিজেদের মাঝে (বড় ধরনের) বেচাকেনা কর তখন সাক্ষী রাখবে এবং লেখক ও সাক্ষী কাউকেও যেন কষ্ট দেয়া না হয়। আর এরূপ করলে নিশ্চয় তা তোমাদের দুষ্কর্ম বলে গণ্য হবে। আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর। (এমনটি করলে) আল্লাহ্ তোমাদের জ্ঞান দান করবেন। আর আল্লাহ্ সব বিষয়ে সর্বজ্ঞ। (সূরা আল বাকারা: ২৮৩)

ঋণ নেয়ার সময় তা লিখে নেয়া এবং তা ফেরত দেয়ার সময় নির্ধারণ করা:

আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ হলো," কারো কাছ থেকে ঋণ নিলে তা ফেরত দেয়ার সময় নির্ধারণ করতে হবে এবং তা লিখিতভাবে হতে হবে।" হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন, 'পরিতাপের বিষয় হলো মুমিন এ দুটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখে না। অর্থাৎ বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার দরুন, ঋণ দেয়ার সময় তারা লিখে না আর কোন সময়ও নির্ধারন করে না এবং বলে দেয় যখন ইচ্ছা তখন ফেরত দিও। এসবের কারণে পরবর্তিতে অনেক ধরনের ত্রুটির সৃষ্টি হয় এবং মন্দ ফলাফল ও তিক্ততার সম্মুখীন হতে হয়।' (তফসীরে কবীর দ্বিতীয় খন্ড ৬৪৪ পৃ)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ খামেস (আই.) বলেন, "আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সৃষ্টজীবের মনমানসিকতা সম্পর্কে জ্ঞাত তাই তিনি বিস্তারিতভাবে বলে দিয়েছেন, এ বিষয়টি লিখিত হতে হবে। কিভাবে লিখতে হবে এবং কে লেখাবে সে সম্পর্কেও দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন, 'আর যার ওপর (ঋণ শোধের) দায়িত্ব সে যেন চুক্তিটি লেখায়।' এর কারণ হলো ঋণ গ্রহিতা যেন চুক্তিতে পরিস্কারভাবে লেখায়, সে এত টাকা ঋণ

নিয়েছে এবং সে এভাবে তার ঋণ পরিশোধ করবে। সে যদি কিস্তিতে টাকা পরিশোধ করার অঙ্গিকার করে তবে তাও যেন পরিস্কারভাবে লেখা হয় ,আমি এ সময়ের মধ্যে এতো কিস্তিতে আমার ঋণ পরিশোধ করবো । ঋণগ্রহিতা পরবর্তিতে যেন এ বাহানা বানাতে না পারে যে আমার ওপর যুলুম হচ্ছে এবং ঋণদাতা আমাকে না জানিয়ে এসব লিখে নিয়েছে।" (খুতুবাতে মাসরুর, দ্বিতীয় খন্ড ৫৬৬ পৃ)

পবিত্র কুরআন নির্দেশ দিচ্ছে, "কিন্তু যার ওপর (ঋণ শোধের) দায়িত্ব সে যদি নির্বোধ বা দূর্বল হয় অথবা সে লিখিয়ে নিতে অসমর্থ হয় তাহলে তার প্রতিনিধি যেন ন্যায্যভাবে (তা) লিখিয়ে নেয় এবং তোমাদের পুরুষদের দুজনকে সাক্ষী রাখে। কিন্তু দুজন পুরুষ পাওয়া না গেলে (উপস্থিত) লোকদের মাঝ থেকে যাদের তোমরা পছন্দ কর (তাদের) একজন পুরুষ ও দুজন নারী (সাক্ষী রাখ)।"

অর্থাৎ ঋণদাতা বা ঋণগ্রহিতা লিখতে না জানলে অন্য কাউকে দিয়ে এ চুক্তি লিখিয়ে নিতে হবে। আর এর জন্য সাক্ষীও রাখতে হবে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ খামেস (আই.) বলেন, "কারবারি লেনদেন হোক বা ব্যক্তিগত লেনদেন, প্রত্যেককে এ বিষয়টি মনে রাখতে হবে এই লেনদেন আদান প্রদানের ক্ষেত্রে যদি সময় লাগে তবে তা লিখিত হতে হবে। আজকাল অনেক লেনদেন মৌখিক হয়ে থাকে। আহমদীদের বর্তমান যুগের এ অভ্যাস পরিত্যাগ করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন সেভাবে লেনদেন করবেন এতেই সবার মঙ্গল।" (খুতুবাতে মাসরুর, দ্বিতীয় খন্ড ৫৬৭ পৃ)

ঋণ গ্রহিতার প্রতি নির্দেশঃ

পবিত্র কুরআন মুসলমানদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলে, "আর তাদের (কথাও ভিন্ন) যারা তাদের (কাছে গচ্ছিত) আমানত এবং তাদের অঙ্গীকার সম্পর্কে যত্নবান থাকে।" (সূরা আল মাআরেজঃ ৩৩)

ঋণ গ্রহিতাকে মনে রাখতে হবে ঋণ পরিশোধ করাও এক কঠিন অঙ্গীকার আর এ সম্পর্কে আমাদের যত্নবান হবার মধ্যেই খোদার সন্তুষ্টি নিহিত। পবিত্র কুরআন বলে কিয়ামতের দিন তোমাদের কাছ থেকে তোমাদের প্রত্যেক অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। ঋণ সম্পকৃত অঙ্গীকার কোন সাধারণ বিষয় নয়। সুতরাং এ অঙ্গীকার পুরণের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা আবশ্যক।

মহানবী (সা.) বলেছেন," তোমাদের মধ্যে সে ই সর্বত্তোম যে ঋণ আদায় করার ক্ষেত্রে উত্তম। "(বুখারী) উপরোক্ত হাদীসে মহানবী (সা.) আমাদের উপদেশ দিচ্ছেন তোমরা নিজেদের ভালো প্রমাণ করতে চাইলে তোমরা নিজেদের কর্মের প্রতি দৃষ্টি দাও। তোমাদের আচার ব্যাবহার ও তোমাদের কর্মপ্রণালী তোমাদেরকে মর্যাদাবান করে। তোমাদের টাকা পয়সা, সহায় সম্পত্তি, সন্তান সন্ততি, গড়ন ও সৌন্দর্য এবং বংশ তোমাদের মর্যাদাবান করে না বরং তোমাদের কর্ম ও নৈতিকতা তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে মর্যাদাবান করে। পার্থিব জগতে জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে লেন দেন হবেই হবে তবে সে ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে এটি তোমাদের পরীক্ষা। আর এতে সে-ই সফল হবে যে তার কর্মের প্রতি যত্নবান। এসব কর্মের মধ্যে সর্বত্তোম হলো যথা সময়ে ঋণ আদায় করা।

নিরুপায় হলে পরেই ঋণ নেয়া যেতে পারেঃ

মহানবী (সা.) বলেছেন, "ইসরার রাতে আমি জান্নাতের দরজাতে লিখিত দেখেছি, সদকার প্রতিদান দশ গুণ দেয়া হবে এবং ঋণ দেয়ার প্রতিদান আঠার গুণ করে দেয়া হবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরীল! ঋণ দেয়া সদকা প্রদান করার চাইতে শ্রেয় কেন? (জিবরীল) উত্তর দিল, যাকে সদকা দেয়া হয় তার কাছে কিছু না কিছু থাকে। কিন্তু ঋণগ্রহিতা শুধুমাত্র প্রয়োজন হলে পরে তা চায়।" (সুনানে ইবনে মাজা, কিতাবুল আহকাম, বাবুল কারজ)

উপরোক্ত হাদীস হতে জানা যায়, শুধুমাত্র নিরুপায় হলে পড়েই ধার কর্জ করা যায়। স্বল্পে তুষ্ট থাকার অভ্যাস মানুষকে অনেক বিপদ থেকে রক্ষা করে। এ পৃথিবীতে অনেক মানুষ বিনা কারনে অথবা তথাকথিত নিজেদের নাক উচু রাখার জন্য ঋণ করে এবং এর মাধ্যমে নিজেও বিপদে পড়ে এবং পরিবারকেও বিপদে ফেলে দেয়।

মহানবী (সা.) বলেছেন উপরের হাত নীচের হাত হতে শ্রেয়। তাই আমাদের মনে রাখা উচিত, নিরুপায় হলে পরে অর্থাৎ কেবল মাত্র বাচার জন্য ঋণ নেয়া যেতে পারে। যথাসাধ্য ঋণ থেকে দুরে থাকাই হলো শ্রেয়। মুহাজিরদেরকে মহানবী (সা.) জঙ্গলের দিকে ইশারা করে তাদের আর্থিক অনটন দুর করার পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং সাহাবাগণ এর ওপর আমল করে আর্থিক অনটন থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। অর্থাৎ পরিশ্রম করতে হবে এবং পরিশ্রমী ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'লা অভাব মুক্ত করেন ও রাখেন।

ঋণ গ্রহিতাকে সুযোগ দেয়াঃ

হযরত উসমান (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'লা এমন ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন যে কেনাবেচার সময় এবং ঋণ দেয়ার সময় ও ঋণ ফেরতের তাগাদা দেবার সময় মানুষকে সুযোগ দিত।" (সুনানে নাসাঈ, কিতাবুল বয়ু, বাবু হুসনিল মুআমিলাতে ওয়ার রিফকে ফিল মুতালিবাতে)

উপরোক্ত হাদীস হতে জানা যায়, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সৃষ্টজীবের প্রতি দয়া প্রদর্শনকে মূল্যায়ন করে থাকেন। বিশেষ করে মানুষ যখন কষ্টে ও কিষ্ঠে জর্জরিত থাকে সে সময়ে দয়া প্রদর্শন করাকে আল্লাহ্ তা'লা অনেক মূল্য দেন। বলা হচ্ছে কেউ চেষ্টা করেও তার পারিপার্শিক অবস্থার কারনে তার ঋণ পরিশোধ করার অঙ্গীকার পুরনে যদি ব্যার্থ হয় তবে তার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে সুযোগ দেয়া অনেক বড় পূণ্যের কাজ। এর প্রতিদানে আল্লাহ্ তা'লা জান্নাত দিয়ে থাকেন।

ঋণ পরিশোধ না করলেঃ

হযরত সালমা বিন আকওয়া (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা মহানবী (সা.) এর কাছে

বসে ছিলাম। এমন সময়ে একটি জানাযা এলো এবং মহানবী (সা.) কে জানাযার নামায পড়ানোর অনুরোধ করা হলো। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, তার কোন ঋণ আছে কি না? সাহাবাগণ বললেন না। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, সে কোন সম্পত্তি রেখে গেছে কি না? সহাবাগণ বললেন না। মহানবী (সা.) তার জানাযার নামায পড়ালেন। .....এর পর তৃতীয় জানাযা আসল, মহানবী (সা.) কে জানাযার নামায পড়ানোর অনুরোধ করা হলো। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, সে কোন সম্পত্তি রেখে গেছে কি না? সাহাবাগণ বললেন না। এরপর তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, তার কোন ঋণ আছে কি না? সাহাবাগণ বললেন তিন দিনার (ঋণ) আছে। তিনি (সা.) বললেন, তোমরা তোমার সঙ্গীর নামাযে জানাযা পড়ে নাও। [অর্থাৎ তিনি (সা.) নামাযে জানাযা নিজে পড়াবেন না, তাই তিনি অন্যদের পড়ে নিতে বললেন।] আবু কাতাদা (রা.) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি এ নামাযে জানাযাটি পড়িয়ে দিন। এর ঋণ আমি শোধ করবো। এর পর তিনি (সা.) সেই নামাযে জানাযাটি পড়ালেন। (বুখারী, কিতাবুল হাওয়ালা)

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, "আমাকে দু:খের সাথে বলতে হয় কিছু লোক এসব বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য রাখে না। আমার জামাতেরও কিছু সদস্য নিজেদের ঋণ আদায় করার ব্যাপারে সচেতন নয়। এটি ন্যায় পরিপন্থি। মহানবী (সা.) এমন (অর্থাৎ ঋণগ্রস্থদের) লোকদের জানাযার নামায পড়াতেন না। প্রত্যেকেই ভালোভাবে মনে রাখবেন, ঋণ শোধ করার ব্যাপারে কোন ধরনের অলসতা দেখাবেন না। প্রত্যেক ধরনের আত্মসাত ও অসাধু কর্ম হতে দুরে থাকতে হবে কেননা এসব কাজ খোদা তা'লার নির্দেশের পরিপন্থি। (মালফুযাত, চতুর্থ খন্ড,৬০৭পৃ)

ঋণ মুক্ত হবার ও ঋণ মুক্ত থাকার দোয়াঃ

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, আমরা তাঁর সৃষ্টজীব, আমরা দূর্বল এবং আমরা তাঁর মুখাপেক্ষী। আমাদের সব প্রয়োজন তিনি মেটাবেন। আমাদের কাজ হলো তাঁর উপাসনা করা এবং তাঁর কাছে নিজেদের সমর্পন করা। তিনি শিখিয়েছেন ,

"ওয়া মাই ইয়াত্তিকা ল্লাহা ইয়াযআল লাহু মাখরাজা। ওয়া ইয়ারযুকহু মিন হায়ছু লা ইয়াহতাসিব। ওয়া মাই ইয়াতাওক্কাল আলাল্লাহে ফাহুয়া হাসবুহু। ইন্নাল্লাহা বালেগু আমরিহি। কাদ জাআলাল্লাহু লেকুল্লে শায়ইন কাদরা।"

অর্থাৎ আর যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে তিনি তার জন্য নিস্ক"তির পথ করে দিয়ে থাকেন। আর তিনি তাকে সেখান থেকে রিযিক দেন যেখান থেকে সে (রিযিক পাওয়ার) ধারনাও করতে পারেনা। আর আল্লাহ্‌র ওপর যে ভরসা করে তিনি তার জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেই থাকেন। আল্লাহ্ সব কিছুরই এক পরিমাপ নির্ধারিত করে রেখেছেন। (সূরা আত তালাক: ৩-৪)

বুজুর্গনরা এই আয়াত পড়ে দোয়া করে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সীমাহীন কল্যাণ প্রাপ্তির কথার উল্লেখ করেছেন। অনেক বুজুর্গ আর্থিক অনটনের সময় এই আয়াত পড়ে দোয়া করতে অনেককে উপদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রিযিক প্রাপ্তির জন্য এ একটি অতুলনিয় দোয়া।

মহানবী (সা.) ঋণ থেকে মুক্তির জন্য দোয়া করতেন ও তাঁর (সা.) উম্মতকেও এ দোয়া করতে শিখিয়েছেন.

"আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল হাম্মে ওয়াল হুযনে ওয়া আউযুবিকা মিনাল আজযে ওয়াল কাসালে ওয়া আউযুবিকা মিনাল জুবনে ওয়াল বুখলে ওয়া আউযুবিকা মিন গালাবাতিদ দায়নে ওয়া কাহরের রেযালে। আল্লাহুম্মাকফেনি বেহালালেকা আন হারামেকা ওয়া আগনেনি বেফাযলেকা আম্মান সেওয়াকা।"

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমি দু:খ কষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি। অসহায়ত্ব ও আলস্য থেকে তোমার আশ্রয় চাই। আর ভীরুতা ও কৃপণতা থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি। আমি ঋণের বোঝা ও লোকদের ক্রোধ থেকে তোমার আশ্রয় প্রর্থনা করি। হে আল্লাহ্! তোমা কর্ত"ক নিষিদ্ধ বস্থর মোকাবেলায় তোমার দেয়া বৈধ জীবনোপকরণ আমার জন্য যথেষ্ট ও পর্যাপ্ত কর। আর অন্য সব কিছুর মুখাপেক্ষিতা হতে মুক্ত কর। কেবল তোমার আশীর্বাদে আমাকে তোমারই মুখাপেক্ষী রাখ।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.) এর সম্পর্কে বর্ণিত, কোন এক ব্যক্তি ২৫ হাজার টাকার ঋণ গ্রস্থ হয়ে তার (রা.) নিকট দোয়ার আবেদন করলে তিনি (রা.) তাকে বললেন, তুমি অনেক বেশী ইস্তেগফার কর, অপব্যায় পরিত্যাগ কর এবং এক পয়সা পেলেও তা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করতে শুরু কর। এই উপদেশের ওপর আমল করে সেই ব্যক্তি ঋণমুক্ত হয়ে গেল। পবিত্র কুরআন আমাদের শিক্ষা দিয়েছে, ইস্তেগফার অধিক মাত্রায় আল্লাহ্‌র দয়াকে আকর্ষন করে। তাই আমাদের মনে রাখা আবশ্যক ইস্তেগফার করা সব কল্যাণ প্রাপ্তির চাবিকাঠি।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে কুরআন তথা ইসলামের শিক্ষার ওপর আমল করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

'ধর্মে কোন ধরনের বলপ্রয়োগ নেই।'....

(সূরা ঃ আল বাকারা : ২৫৭)

তুমি বল, এ সত্য তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (প্রেরিত)। সুতরাং যে চায় সে ঈমান আনুক এবং যে চায় সে অস্বীকার করুক। ....

(সূরা ঃ আল কাহ্‌ফ : ৩০)

শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)

মাহমুদ আহমদ সুমন

(২য় কিস্তি)

নবুওয়তের পূর্ব-জীবনই নবুওয়তের প্রমাণঃ

মহান খোদা তা'লা এ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত নবী-রসূলগণকে (আ.) মনোনীত করে পাঠিয়েছেন, তাঁদের ইতিহাস পাঠ করলে জানা যায় যে, নবুওয়ত লাভের পূর্বে খোদা মনোনীত প্রত্যেক নবীই তৎসময়ের শ্রেষ্ঠ-মানব ছিলেন। নবুওয়তের মর্যাদা লাভের পূর্ব থেকেই তাঁরা ছিলেন জাতি, গোত্র এবং দেশের শ্রেষ্ঠ-সন্তান। তাই সত্য প্রত্যাদিষ্টকে যাচাই করার পদ্ধতিও খোদা তা'লাই আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁদের নবুওয়ত লাভের পূর্ব-জীবন পবিত্র হবে। মানবতার সর্বোত্তম আদর্শ, শ্রেষ্ঠ-নবী, খাতামান নবীঈন, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নবুওয়ত লাভের পূর্ব-জীবন যদি আমরা পাঠ করি, তাহলে দেখতে পাই, তিনি কত উ"চ-মার্গের মানব ছিলেন। তাঁর জীবনের উপর এক চুল পরিমাণ অপবাদ লাগানোর সুযোগও তিনি (সা.) দেননি। তিনি (সা.) নবুওয়তের দাবীর পূর্বে সমস্ত জীবন-ব্যাপী অনন্য-সাধারণ সৎ এবং সাধু ব্যক্তিরূপে প্রমাণিত ছিলেন। আর তিনি (সা.) নবুওয়ত লাভের পূর্বে দীর্ঘ সময় তাদের মাঝে কিভাবে কাটিয়েছেন, তাও সবার জানা রয়েছে। যেভাবে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে-

"ফাকাদ্ লাবিছতু ফীকুম ওমরাম্‌মিন্ কাবলিহী আফালা তা'কিলুন" অর্থাৎ-নিশ্চয় এর (নবুওয়তের দাবীর) পূর্বেও আমি তোমাদের মাঝে এক দীর্ঘ-জীবন কাটিয়েছি। তবুও কি তোমরা বিবেক-বুদ্ধি খাটাবে না? (সূরা ইউনুস:১৭)

কোরাইশ পৌত্তলিকদের ধারণা ছিল,

কুরআন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর একটা মনগড়া রচনা। একে তিনি অহেতুক আল্লাহ্ প্রদত্ত বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। অপরদিকে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দাবী ছিল, এটা তাঁর রচনা করা কিতাব নয়, বরং আল্লাহ্‌র নিকট থেকে ওহীযোগে তাঁর কাছে এসেছে। উপরের আয়াতটা পৌত্তলিকদের ঐ ধারণা খন্ডন এবং নবী করীম (সা.)-এর দাবীর সমর্থনে একটা শক্তিশালী যুক্তি পেশ করেছে। অন্যান্য যুক্তি প্রমাণ না হয় বাদই গেল, কিন্তু নবী করীম (সা.)-এর বাস্তব-জীবনটাতো তাদের চোখের সামনেই রয়েছে। নবুওয়তের আগে তিনি চল্লিশ বছর তাদের সাথেই কাটিয়েছেন। তাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন। কৈশর, যৌবন পেরিয়ে প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছেছেন তাদেরই চোখের সামনে। তাঁর ওঠা-বসা, চলা-ফেরা, থাকা-খাওয়া, লেন-দেন, মেলা-মেশা, বিয়ে-শাদী, ইত্যাদি যাবতীয় সামাজিক-সম্পর্ক তাদের সাথেই ছিল। তাঁর জীবনের কোন ব্যাপারই তাদের অজানা ছিল না। এমন জানাশোনা ও চাক্ষুস প্রমাণের চেয়ে গ্রহণযোগ্য আর কি হতে পারে? তাঁর জীবনে দু'টো জিনিস অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল এবং প্রত্যেক মক্কাবাসীই তা জানতো।

নবুওয়তের আগে চল্লিশ বছরের জীবনে তিনি এমন কোনো শিক্ষা-দীক্ষা বা সাহচর্য পাননি, যার মধ্যে নবওয়াতের দাবী করার অব্যহতি পরে তিনি যে বহুমুখী জ্ঞানের পরিচয় দেন তার কোন উৎস খুঁজে পাওয়া যায়।

কুরআনের সূরাগুলোতে যেসব বিষয় ধারাবাহিকভাবে আলোচিত হয়েছে, কুরআন নাযিলের আগে কখনো সে সব

বিষয়ে তাঁকে চিন্তা করতে, কথা বলতে ও

মতামত প্রকাশ করতে দেখা যায়নি। এমনকি চল্লিশ বছরে পদর্পণ করা মাত্রই হঠাৎ তিনি যে দাওয়াত দেওয়া শুরু করলেন, তার কোন আয়োজন বা প্রস্থতির চিহ্ন তাঁর চালচলনে ও কথাবার্তায় চল্লিশ বছরের মধ্যে কোন লোক বা ঘানিষ্ঠজন বা আত্মীয় স্বজনের চোখে পড়ে নাই। এ থেকে স্পষ্টতই প্রমাণিত হয় যে, কুরআন তাঁর মস্তিষ্কের ফসল নয় এবং বাইরে কোথাও তাঁর উৎপত্তি ঘটেছে এবং তা তাঁর ভিতরে আমদানী হয়েছে। মানুষের মস্তিষ্ক তার জীবনের কোন স্তরে গিয়ে হঠাৎ কোনো জিনিস উপস্থাপিত করতে সক্ষম হয়। যে স্তরে গিয়েই কোন কিছু উপস্থাপিত করুক না কেন, তার পূর্ববর্তী স্তরে তার প্রস্থতি ও বিকাশ-বৃদ্ধির লক্ষণ সমূহ দেখা যাবেই। এ জন্যেই মক্কার কোনো কোনো চতুর লোক বুঝতে পেরেছিল যে, কুরআনের উৎপত্তি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মস্তিষ্ক থেকে ঘটেছে এমন কথা বলা একেবারেই বালখিল্য হবে। তাই তারা বলতে শুরু করে দিল যে, নেপথ্যে অন্য কোনো ব্যক্তি অবশ্যই রয়েছে, যে মুহাম্মদ (সা.)কে এসব কথা শিখিয়ে দেয়। কিন্তু এ-কথা একেবারেই বাজে কথা সাব্যস্ত হলো। কেননা, মক্কা তো দূরের কথা, সারা আরবে এমন যোগ্যতার অধিকারী মানুষ একজনও ছিল না, যাকে দেখিয়ে বলা যায় যে, অমুক এসব বাণী রচনা করেছে। আসলে এমন যোগ্যতা যার থাকে, সে কোনো সমাজেই অজানা অচেনা থাকতে পারে না।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুওয়তের পূর্ব-জীবনের দ্বিতীয় উজ্জ্বল-বৈশিষ্ট্য ছিল মিথ্যা,

প্রতারণা, ধোকাবাজী, ঠকামি, হীনতাসহ

কোনো প্রকারের দোষ নামমাত্রও তাঁর চরিত্রে পাওয়া যায় নাই। গোটা সমাজে এমন কথা বলার মত কেউ ছিল না যে, দীর্ঘ চল্লিশ বছরের মেলামেশাকালে তাঁর আচরণে এ-জাতীয় কোনো দোষত্রুটি দেখতে পেয়েছে। যে ব্যক্তিই তাঁর সংস্পর্শে এসেছে, সে তাঁকে একজন পরম সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ, সুচরিত্র ও বিশ্বস্ত-মানুষ হিসেবেই দেখেছে। নবুওয়তের পাঁচ বছর আগে কাবা শরীফ মেরামতের সময় একটি ঘটনা ঘটে, যা প্রায় সবারই জানা রয়েছে। পবিত্র হাজরে আসওয়াদ, যাকে 'কালো পাথর'-বলা হয়–এই পাথর যথাস্থানে কে নিয়ে স্থাপন করবে, তা নিয়ে কুরাইশ বংশের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ঝগড়া বেধে যায়। শেষ পর্যন্ত তারা একটি আপোষ-ফর্মূলা বের করে যে, কাল সকালে যে ব্যক্তি সর্ব প্রথম হেরেম শরীফে ঢুকবে, তাকেই শালিশ মানা হবে। পরদিন দেখা গেল, হেরেম শরীফে হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রথম প্রবেশ করলেন। তাঁকে দেখামাত্রই সকলে হৈ-চৈ করে উঠলো এবং বলতে লাগলো এতো সেই ন্যায়পরায়ণ ও সৎ মানুষ। আমরা তাঁর শালিসীতে রাজি আছি। এই হলো হযরত মুহাম্মদ (সা.)। এভাবে নবীর পদে নিয়োগের আগেই আল্লাহ্ পাক গোটা কোরাইশ বংশের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর ন্যায়পরায়ণতার স্বপক্ষ্যে সাক্ষ্য নিয়ে নিলেন। এরপর সেই আল-আমীন কোন অন্যায় ও অসত্যের আশ্রয় নিতে পারে, তা চিন্তা করাও মুর্খতার কাজ। যে ব্যক্তি সারা জীবনে কখনো কোন সামান্য ব্যাপারেও মিথ্যার আশ্রয় নেননি, ধোকাবাজি, ফেরেববাজি করেন নাই, সেই ব্যক্তি হঠাৎ করে নিজের মনগড়া একটা কথা মানুষকে শুনিয়ে আল্লাহ্‌র কথা বলে চালিয়ে দিবেন, এটা কি সম্ভব?

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন-

"ওয়াকাযালিকা আওহাইনা ইলাইকা রুহাম্ মিন আমরিনা, মা কুন্‌তা তাদরী মালকিতাবু আলাল ঈমানু ওয়ালাকিন যায়ালনাহু নুরান নাহ্‌দিবিহী মান্ নাশাউ মিন ইবাদিনা, ওয়া ইন্নাকা লা তাহ্‌দি ইলা ছিরাতিম্

মুসতাকিম।"

অর্থাৎ-আর এভাবেই আমরা তোমার প্রতি নিজ আদেশে এক জীবনদায়ী বাণী ওহী করলাম। কিতাব কী এবং ঈমান কী, তুমি তা জানতে না। কিন্তু আমরা এ (বাণীকে) জ্যোতি বানিয়েছি (এবং) এর মাধ্যমে আমরা আমাদের বান্দাদের মাঝে যাকে চাই হেদায়াত দেই। আর নিশ্চয় তুমি সরল সুদৃঢ় পথে (লোকদের) পরিচালিত করছ (সূরা আশ-শুরা: ৫৩)।

নবুওয়াত পাওয়ার আগে হযরত মুহাম্মদ (সা.) কল্পনাও করতে পারেন নাই যে, একখানা কিতাব তাঁর পাওয়া উচিত ছিল। এমনকি আসমানী-কিতাব সমূহ ও তার বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাঁর কিছুই জানা ছিল না। আল্লাহ্‌র উপর তাঁর ঈমান ঠিকই ছিল। কিন্তু তিনি জানতেন না যে, সেই সাথে ফেরেশ্‌তা, নবুওয়ত, আসমানী কিতাব ও আখেরাত সম্পর্কেও অনেক কিছু বিশ্বাস করতে হয়। মক্কাবাসীর কাছেও তাঁর নবুওয়তের ঘোষণা ছিল একেবারে আকস্মিক ও অভাবনীয়। সেই ঘোষণার আগে তাঁর মুখে কেউ কোনদিন শোনে নাই যে, আল্লাহ্‌র কিতাব এবং তাঁর নির্ধারিত প্রত্যেক জিনিসের প্রতি ঈমান আনতে হবে। কোনো ব্যক্তি যদি আগে থেকে নিজে নিজের নবী হবার আয়োজন করে, তবে সে তাঁর নবুওয়ত নিয়ে এত উদাসীন হতে পারে না। চল্লিশ বছর ধরে যারা তাঁর সাথে মেলামেশা করছে, তারা তাঁর মুখ থেকে কিতাব ও ঈমান সম্পর্কে একটা কথাও শুনবে না, আর ঠিক চল্লিশ বছর পূর্ণ হতেই হঠাৎ ঐসব বিষয়ে সে অনর্গল বক্তৃতা দিতে শুরু করবে! যেভাবে কুরআনে উল্লেখ আছে–

"ওয়ামা কুনতা তারজু আঁইইউলকা ইলাইকাল কিতাবু ইল্লা রাহমাতাম্ মিররাব্বিকা ফালা তাকুনান্না জাহিরাল্‌লিল কাফিরিন।" অর্থাৎ আর তোমাকে কিতাব দান করা হোক, এমন কোন আকাড়খা তুমি করতে না। কিন্তু (এ দান) তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কৃপাবিশেষ। অতএব তুমি কখনো কাফিরদের সাহায্যকারী হয়ো না (সূরা আল-কাসাস: ৮৭)।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে কখনো নবুওয়ত লাভের কোন স্বপ্ন দেখেননি, এই আয়াতই তার অকাট্য প্রমাণ। এখানে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুওয়তের প্রমাণ হিসেবে একথা বলা হয়েছে। আমরা যদি হযরত মূসা (আ.)-এর নবুওয়ত লাভের বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করি, তাহলে দেখতে পাই, তিনি যে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে নবী মনোনিত হচ্ছেন, তা সম্পর্কে কিন্তু তিনি সামান্যতম অবহিত ছিলেন না। নবী হওয়ার ইচ্ছা বা আকাখা তো দূরের কথা, তার সম্ভাবনার ধারণাও তাঁর

মনে কখনো উঁকি মারে নাই। তাঁর আদর্শের বলে তাঁকে নবী বানানো হয় এবং তাঁকে দিয়ে এমন বিস্ময়কর কাজ সম্পন্ন করা হয়, যার সাথে তাঁর অতীত- জীবনের কোনো মিল নাই।

অবিকল এটাই ঘটেছিল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনে। হেরা পর্বতের গুহা থেকে নবুওয়তের ঘোষণা নিয়ে নেমে আসার একদিন আগ পর্যন্ত তাঁর জীবনধারা কিরূপ ছিল, তিনি কি কাজ করতেন এবং কি ধরণের কথা-বার্তা বলতেন, কি বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করতেন, মক্কার লোকেরা তা ভালো করেই জানতো। তাঁর জীবনে ঐ অংশটা পুরোপুরি ভাবেই সততা, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, সুচরিত্রতার উজ্জ্বল নিদর্শন ছিল। এই অবস্থা ছিল একজন অতিশয় ভদ্র, নিতান্ত শান্তিপ্রিয় ও নিরীহ, ওয়াদা ও চুক্তি রক্ষায় অটল, অন্যের অধিকার ও পাওনা দিয়ে দেয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত যত্নবান এবং একজন অসাধারণ পরোপকারী ব্যক্তির জীবন। এগুলো ছিল তাঁর জীবনের প্রধানতম ও অসাধারণ গুরুত্বহ বিষয়। কিন্তু তা সত্যেও তাঁর ভিতরে এমন কোনো জিনিসের অস্তিত্ব ছিল না যে, যা দেখে কারো কল্পনায় আসতে পারে যে, এ সাধু সজ্জন লোকটি অতি তাড়াতাড়ি নবুওয়তের দাবী করে বসবেন। তাঁর সাথে যারা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতো, যারা তাঁর আত্মীয়স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী বা বন্ধু-বান্ধব ছিল, তাদের মধ্যে কেউ বলতে পারতো না যে, তিনি আগে থেকেই নবী হওয়ার প্রস্থতি নিচ্ছিলেন। হেরা গুহার

সেই আলোড়ন-সৃষ্টিকারী মুহূর্তটার পর পরই আকস্মিকভাবে তিনি যে-সব বিষয়ে

বক্তব্য রাখতে শুর করেছিলেন, সে সব বিষয় আগে তাঁর মুখ থেকে কেউ শুনে নাই। কুরআনের আকারে লোকেরা তাঁর কাছ থেকে যে বিশেষ ধরণের ভাষা, পরিভাষা ও শব্দ শুনতে শুরু করে, তা আগে কেউ তাঁর কাছ থেকে শুনে নাই। এর পূর্বে কখনও তিনি ওয়াজ নছিহত বা বক্তৃতা করতে দাঁড়ান নাই। কখনো কোন দাওয়াত নিয়েও মাঠে নামেন নাই। তাঁর কোনো তৎপরতা থেকে এমন কোনো আভাস পাওয়া যায় নাই যে, তিনি সামাজিক জীবনের সমস্যাবলীর সমাধান অথবা ধর্মীয় বা নৈতিক সংস্কারের কোনো কর্মসূচী হাতে নেয়ার পরিকল্পানা করেছেন।

(চলবে)

masumon83@yahoo.com

প্রথম বাঙালি শহীদ
মোহাম্মদ ওসমান গনি

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

(১ম কিস্তি)

মোহাম্মদ ওসমান গনি

আল্লাহ্ তাআলার পুরস্কার

বিশ্বের স্রষ্টা ও মালিক হচ্ছেন রাব্বুল আল-আমিন আল্লাহ্ তাআলা। তাঁর ইচ্ছায় সব বিরাজমান, আবার তাঁর নির্দেশেই ধ্বংস অনিবার্য। তাঁর সকল সৃষ্টি মানব সেবায় নিয়োজিত। তাই মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ট প্রাণী হিসেবে স্বীকৃত। মানুষকে তার শ্রেষ্ঠত্ব হওয়ার উপযোগী উপাদান দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের ভাষায়–নিশ্চয় আমরা মানুষকে সর্বোৎকৃষ্ট উপাদানে সৃষ্টি করেছি। (সূরা আত্ তীন ৯৫ : ৫)।

সেজন্যই মানুষের বুদ্ধিমত্তা, ধ্যান-ধারণা ও জ্ঞানের উৎকর্ষতা সৃষ্টির অন্যান্য সকল জীব হতে উৎকৃষ্ট। মানুষের মনুষ্যত্বের বিরাজমান গুণাবলী সর্বদা তাঁকে সষ্টির রহস্য, প্রভুর কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্য এবং সৃষ্টি জীবের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশে অনুপ্রাণিত করে। জন্ম, বেঁচে থাকা ও মৃত্যু সবই আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছার উপর। মানুষের নিজের আমিত্ব বলে কিছুই নেই–এ চিরন্তন সত্যটি তাঁর অনুভূতিতে জাগ্রত হয়। আর এসব পবিত্র ব্যক্তিরা আল্লাহ্ তাআলার নিকট থেকে ঐশী প্রেরণা ও প্রজ্ঞা লাভে আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি লাভ করে। পবিত্র কুরআনের আল্লাহ্ তাআলার শিক্ষা–লোকদের মধ্যে কতক এমন আছে, যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজেদের জীবন বিক্রয় করে দেয় এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ এইরূপ বান্দাগণের প্রতি অত্যন্ত মমতাশীল (সূরা আল-বাকারা ২ : ২০৮)।

তাই নিজের আমিত্বকে বিসর্জনে খোদার দেয়া জড় দেহ ও মন-প্রাণ সর্বদা তাঁর তরে বিলিয়ে দেয়া এবং তাঁর গুণকীর্তন করা মানবের ইহজীবনের স্বার্থকতা এবং পরকালে স্বর্গ-সুখের আবাসন প্রাপ্তির যোগ্যতা। আর এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং এটাই মানবের ইবাদতের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। আল্লাহ্ তাআলা বলেন–আমি জীন ও ইনসানকে কেবল আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি (সূরা আয্‌যারিয়াত ৫১ : ৫৭)

সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনে যারা যত বেশি প্রচেষ্টা করে, তারাই তত বেশি আল্লাহ্ তাআলার রহমত প্রাপ্ত হন। এসব পবিত্র-আত্মা আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি লাভ করে খোদার সান্নিধ্য লাভ করে। তাদের মাঝে খোদার সিফতের বিকাশ ঘটে। আর এসব সার্থক ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে আল্লাহ্ তাআলার বিভিন্ন পুরস্কার। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত সেই সব পুরস্কার হলো–যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে তাঁরা ঐসব লোকের মধ্যে শামিল হবে যাদেরকে আল্লাহ্ পুরস্কার দান করেছেন–নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সালেহগণের মধ্যে এবং তারাই সাথী হিসেবে উত্তম (সূরা আন্ নিসা ৪ : ৭০)।

হাইউল কাইয়ুম অর্থাৎ চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী আল্লাহ্ তাআলা মানবের প্রতি তাঁর রহমত নাযিলের শুরুতে অর্থাৎ বান্দার সাথে তাঁর প্রেমসূত্রের সেতুবন্ধন গড়ে তোলার লক্ষ্যে সর্ব প্রথম হযরত আদম (আ.)কে নবুওয়াতের মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। পরবর্তীতে একত্ববাদের শিক্ষার ক্রমধারায় যুগে যুগে অসংখ্যক নবী রসূল আবির্ভূত হন এবং বিভিন্ন নবুওয়াতের অনুবর্তীতে অনেক আদম সন্তান সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহ পুরস্কার লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। আখেরী জামানায় উম্মতি নবী হিসেবে আবির্ভূত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর শিষ্যত্ব গ্রহণকারী অনেক পুণ্যআত্মা এসব বিভিন্ন পুরস্কার লাভ করেছেন এবং এর প্রবাহমান ধারা অব্যাহত রয়েছে। তন্মধ্যে জামাতে আহমদীয়ার প্রথম শাহাদতের পুরস্কার লাভের সৌভাগ্যবান ব্যক্তি আফগানিস্তানের হযরত মৌলভী আব্দুর রহমান (রা.)। তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর জীবদ্দশায় ১৯০১ সালে নির্মম ভাবে শহীদ হন। শ্বাসরুদ্ধ করে তাঁকে শহীদ করা হয়। দ্বিতীয় জন আফগানিস্তানের খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব সাহেবযাদা হযরত মাওলানা আব্দুল লতিফ (রা.)। তিনি সরকারি যাতাকলের নিষ্পেষণে প্রস্তরাঘাতে ১৯০৩ সালে হাসীমুখে শাহাদতের পিয়ালা পান করেছেন।

অনুরূপভাবে বাংলার মাটিও শহীদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। বাংলার সেই প্রথম শাহাদতের সৌভাগ্যবান ব্যক্তি শহীদ মোহাম্মদ ওসমান গনি। ১৯৬৩ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অনুষ্ঠিত সালানা জলসায় তিনি বীরত্বের সাথে শাহাদতকে বরণ করে নেন। বাংলার আকাশে শহীদের প্রথম ঝান্ডা উড়ে। এদেশে শহীদের রহমতের বারী বর্ষণের সূচনা হয়।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

বর্তমান মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া থানার অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম ধুল্যা। এদেশের অন্যান্য গ্রামের মত সুজলা-সুফলা ও শস্য-শ্যামল ছাঁয়াঘেড়া আদর্শ পল্লী। বাংলার কবি এমন গ্রামের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মোহেই মনের আনন্দে গেয়েছেন–

আমাদের গ্রামখানি ছবির মতন
মাটির তলায় এর ছড়ানো রতন।

তবে ধুল্যা গ্রামে শুধু মাটির তলায় নয়, মাটির ওপরেও রতন ছড়িয়ে ছিল। এ গ্রামের সরকার বাড়ি সম্ভ্রান্ত হিসেবে বৃটিশ আমল থেকে সুপরিচিত। ধর্মপরায়ণ আদর্শ মুসলমানের বাড়ি হিসেবে খ্যাতি বিদ্যমান। এ বাড়ির জবড়ী বেপারীর নাম ডাক বহু দূর প্রসারিত। তাঁর সুযোগ্য সন্তান মোহাম্মদ ওমর উদ্দিন সরকারের ঔরস্যে ১৯৩১ সালে ধর্মজগতের ইতিহাসে আত্মোৎসর্গকারী এক সুফি সাধকের জন্ম হয়। মাতাপিতা আদর করে তাঁর নাম রাখেন মোহাম্মদ ওসমান গনি। তিনি ছিলেন চার ভাই সাত বোনের মধ্যে তৃতীয় এবং ভাইদের মধ্যে প্রথম। তারা হলেন :–

১। খায়রুন্নেসা বেগম ২। তালুকজান বেগম ৩। মোহাম্মদ ওসমান গনি ৪। মোহাম্মদ আওলাদ হোসেন ৫। সায়েমা খাতুন ৬। জমিলা খাতুন ৭। জুহেরা বেগম ৮। নুরজাহান বেগম ৯। আজমত আলী ১০। নবজাত অবস্থায় মারা যান এবং ১১। সুফিয়া বেগম।

ওসমান গনির নানার কুলও ছিল প্রসিদ্ধ। ধুল্যা গ্রামের নিকটবর্তী নওগাও খাঁ বাড়ির সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা সায়েদুন্নেসা খানম তাঁর গর্বিত জননী। ধর্মপরায়ণ আদর্শবতী মহিলা হিসেবে তাঁর পরিচিতি ছিল। তিনি তাঁর দশটি সন্তানকে নৈতিকতা ও ধর্মীয় শিক্ষায় উত্তম মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। পরোপকার, সমাজসেবা এবং মানুষের দুঃখ কষ্ট লাগবে সহমর্মিতা তাঁর জীবনের অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল। ওসমান গনির পিতা ওমর উদ্দিন সরকার জ্ঞানবান বিদ্যানুরাগী ও ধার্মিক ব্যক্তি হিসেবে সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। পাটের ব্যবসা ছিল তাঁর পেশা। ঢাকা থেকে কোলকাতায় ছিল তাঁর ব্যবসার বিস্তৃতি। তৎকালীন পূর্ববঙ্গের সোনালী আঁশের ব্যবসায়ী সোনার মানুষ ছিলেন তিনি। দেশী-বিদেশী অনেক শিক্ষিত সুধিজনের সাথে ছিল তাঁর আন্তরিক সখ্যতা। নিজে উ"চ শিক্ষিত না হলেও শিক্ষার প্রতি ছিল তাঁর বিশেষ অনুরাগ। ফলে ওসমান গনির মাতৃ ও পিতৃ উভয় কূলেই ছিল অপরিমেয় অর্থ বিত্ত, প্রভাব-প্রতিপত্তি, ধর্মপরায়ণতা এবং শিক্ষার আলোতে আলোকিত হওয়ার অদম্য অনুপ্রেরণা। তাই তাঁর মাতাপিতা নিজ সন্তানদেরকে দুধে ভাতে বড় করার সাথে ধর্মীয় তালিম তরবিয়ত ও জাগতিক শিক্ষা দিয়েছেন।

বাল্যকাল

ধার্মিক মাতাপিতার দু'টি কন্যা সন্তানের পর লাল টুকটুকে গোলাপের মত পরিস্ফুটিত পুত্র ওসমান গনির জন্ম হলে অভিভাবকদের বুকটা ভরে যায়। প্রাণ খোলে সবাই দোয়া করেন–'হে আল্লাহ্, তাকে দীর্ঘ- জীবন দান কর, অনেক বড় কর, ওসমান গনি নামের সার্থকতায় আলোকিত মানুষ হিসেবে তেজোদীপ্ত কর'। ফলে বাল্যকাল থেকেই তিনি ধর্মপরায়ণ, উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী একজন ভাল মানুষ হিসেবে গড়ে উঠেন। তাঁর মেধা, বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার প্রভাব পড়ে। প্রতিভাব বিকাশ ঘটে। গ্রামের দুরন্ত বালক, প্রাণ চঞ্চল, দুর্বার, উদ্দমী, ডানপিটে, পরোপকারী ছেলে হিসেবে সকলের স্নেহভাজন হয়ে উঠেন। সমবয়সীদের সাথে খেলার মাঠে, পুকুরে সাঁতার কাটায়, খালে-বিলে মাছ ধরায়, গাছে চড়ে পাখীর ছানা ধরে পোষ মানানো, সর্বত্রই তাঁর বুদ্ধিমত্তার ছাপ পরিলক্ষিত হয়।

মানব সেবা তাঁর জীবনের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল। আত্মীয় অনাত্মীয় কেউ অসুস্থ হলে তার সেবা শুশ্রুষা ও সুচিকিৎসার জন্য তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। গ্রামের প্রচলিত ডাক্তার কিংবা মানিকগঞ্জ শহরে অবস্থিত বড় ডাক্তারের নিকট নিয়ে যেতেন। অবস্থার প্রেক্ষিতে কখনও শহর থেকে বড় ডাক্তারকে গ্রামে নিয়ে এসে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন। মানুষের দুঃখ-কষ্ট লাঘবে সহমর্মিতা প্রদর্শনে সর্বদা তাদের পার্শ্বে দাঁড়িয়েছেন, বিভিন্নভাবে সাহায্য- সহযোগিতা করেছেন। নিজের কাছে অর্থ না থাকলে বিত্তশালীদের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহ করে তা বিলিয়ে দিয়েছেন।

বাল্যকাল থেকেই মানব সেবার উদ্দেশ্যে তিনি একটি সমিতি গঠন করেছিলেন। গ্রামে তাঁর সমবয়সী অনেক ছেলে ছিল এ সমিতির সভ্য। তিনি ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা কর্ণধার। এ সংগঠনের লক্ষ্য ছিল :–

১। মানব কল্যাণে কাজ করা,

২। ছেলেমেয়েদেরকে স্কুলে যাবার জন্য উদ্বুদ্ধ করা,

৩। খেলাধূলার ব্যবস্থা করা,

৪। পাঠ অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা এবং

৫। সদস্যদেরকে ভাল-মানুষ হওয়ার শিক্ষা দেওয়া।

পনরশ' বছর পূর্বে, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) নবুওয়াত লাভের আগে, মানব সেবার উদ্দেশ্যে 'মজলিসে হিলফুল ফুজুল' নামে যে সংগঠন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আরব ভূমিতে জনসেবা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখেন এবং মক্কাবাসীর মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন, সে আদর্শের অনুপ্রেরণায় সেদিন মানিকগঞ্জের ধুল্যা গ্রামে ওসমান গনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আদর্শ এ যুব-সংগঠন। যার মাধ্যমে সমাজ সেবায় যুগপৎ অবদান রাখেন এবং গ্রামবাসীর নিকট অনেক সমাদৃত ও প্রশংসিত হয়। তাই গ্রামের লোকজন বলতেন– 'ওসমান গনির মত আদর্শবান ছেলে আমাদের দশ গ্রাম জুড়ে একজনও নেই। সে সরকার বাড়ির মুখ উজ্জ্বল করেছে।' সেজন্য তিনি সকলের অতি স্নেহভাজন ও আর্শীবাদ-পুষ্ট ছিলেন।

সে সময় একবার ধুল্যা গ্রামে এক বিশিষ্ট পীর সাহেবের আগমন হয়েছিল। গ্রামের লোকজন দলবেঁধে তার সাথে সাক্ষাৎ করে দোয়ার আরজ জানান। ওমরউদ্দিন সরকার তাঁর দুই ছেলে ওসমান গনি ও আওলাদ হোসেনকে নিয়ে এ পীর সাহেবের নিকট যান এবং তাদের জন্য দোয়ার আরজ করেন। তখন পীর সাহেব বালক ওসমান গনিকে আদর করে বলেন–সরকার সাহেব, আপনার এ ছেলে অনেক বড় হবে। তার ভবিষ্যৎ-জীবন অনেক উজ্জ্বল হবে। তবে সে বিয়ে করবে না। বাস্তবে তাঁর জীবনে তা-ই প্রতিফলিত হয়েছিল।

শিক্ষা জীবন

বিদ্যানুরাগী পিতা ওমর উদ্দিন সরকারের একান্ত আশা প্রচেষ্টা ও দোয়া ছিল তাঁর স্নেহধন্য বড় ছেলে ওসমান গনি উ"চ শিক্ষায় দেশ বরণ্যের ব্যক্তিত্বের অধিকারী হোক এবং দেশের খ্যাতিমান ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হোক। তাই পিতা বুকভরা আশা নিয়ে তাকে নিজ গ্রামে অবস্থিত ভুবন মোহন উ"চ বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেন। এ বিদ্যালয়টি ১৯২০ সালে তৎকালীন এক জমিদার কর্ত"ক স্থাপিত। স্কুলে অধ্যয়নের শুরুতেই তিনি অধ্যবসায়ী ছিলেন। শিক্ষকদের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা, সহপাঠীদের সাথে সখ্যতা এবং তাঁর বিনয়-ব্যবহার সকলকে মু" করে। স্কুলে খেলাধূলা ও ওয়াজ মাহফিলসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজনের কাজে তাঁর ভূমিকা সকলের দৃষ্টিনন্দিত হয়। লেখাপড়ায় প্রতি বছর কির্তীমান ফলাফল লাভ করেন। অষ্টম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার পর ১৯৪৮ সালে পিতা তাঁকে বিন্দাবন চন্দ্র রাধা গোবিন্দ্র উ"চ বিদ্যালয়ে ভর্তি করেন।

(চলবে)

হিফজুল কুরআন কাস শুরু ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

কৃষিবিদ - মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী

মহান খোদার অশেষ কৃপা ও দয়ার ফজলে গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০১২ দারুত তবলীগ কমপ্লেক্সে ৮ জন ছাত্রের সমন্বয়ে জামাতে আহমদীয়া বাংলাদেশ এই প্রথম হিফজুল কুরআন শিক্ষা কোর্স তথা 'মাদ্রাসাতুল হিফজুল কুরআন, আহমদীয়া' শুরু করেছে, আলহামদুলিল্লাহ্। এই নিয়ে এ বছরের জন্য বন্ধুগণের সমীপে কিছু শুভ সংবাদ দিতে চাই।

আমাদের জন্য এ বছরের প্রথম শুভ সংবাদটি হলো এই যে, ইনশাআল্লাহ্ এ বছর আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ আহমদীয়াতের শতবর্ষ জুবিলী অনুষ্ঠান উদযাপন করতে যাচ্ছে। ইহা আমাদের জন্য অতীব গৌরবের কথা, প্রফুল্ল হবার কথা। আর ইহা এজন্যই শুভ সংবাদ যে, পৃথিবীর আর কোন দেশই আহমদীয়াতের শতবর্ষ জুবিলী অনুষ্ঠান উদযাপন করার সৌভাগ্য লাভ করেনি। কেবল বাংলাদেশই প্রথম এ-ধরণের কল্যাণকর-অনুষ্ঠান করার সৌভাগ্য লাভ করেছে, আলহামদুলিল্লাহ্.....এ অনুষ্ঠান উদযাপন করতে গিয়ে আমাদের এক চোখে যেমন আনন্দের উচ্ছ্বাস, তেমনিভাবে অন্য চোখে বয়ে যাচ্ছে কান্নার বন্যা। এ কান্নার কারণ এজন্যই যে, আজ হতে শতবর্ষ পূর্বে যারা এ জামাত প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে শহীদ হয়েছেন, অর্থ সম্পদ হারিয়ে নি:স্ব হয়েছেন, পিত্রালয় থেকে ত্যাজ্য-সন্তান স্বীকৃত হয়ে বেরিয়ে এসেছেন, চাকরি বাকরি ও ব্যবসাচ্যুত হয়ে সর্বহারা হয়েছেন, রমনীগণ স্বামী-পরিত্যক্তা হয়ে বিধবা হয়েছেন, কেউ কেউ আবার আহমদীয়াত গ্রহণের কারণে চিরকুমারী রয়ে গেছেন, কৃষকগণ তার জমির ফসল হতে বঞ্চিত হয়ে হীন-দরিদ্র হয়েছেন, খ্যাত-বিখ্যাত পীর-পুরোহীতগণ তাঁদের হাজার হাজার শিষ্যের দেয়া নজরানা ও ভক্তি-ভালাবাসাকে সহাস্যে বর্জন করেছেন, অখ্যাত অজ্ঞ গ্রাম্য ও সরলমনা সজ্জন, যারা তখনকার দিনে প্রতিকূল হাজার হাজার মাইল বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে কাদিয়ান পৌঁছে সেখানকার স্বর্গীয় প্রতিনিধির সাহাবা হয়ে সেই জ্যোতির ঝলক এনে এদেশের অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়গুলিকে আলোকোজ্জ্বল করেছেন, আমরা আজ তাদেরকে পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি আর অশ্রু ফেলি প্রগাঢ় ভালবাসায়।

হে পুণ্যবান আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ পূর্বসূরীগণ! তোমরা আমাদের নয়নমণি। আমাদের আত্মার পরমাত্মীয়। তোমরা আমাদের মাথার স্বর্ণতাজ। আমরা তোমাদেরকে মোটেই ভুলিনি আর কখনো ভুলব না। তোমাদের নেক-আমলকে নিয়েই আজ আমাদের এ আনন্দের আয়োজন, আনন্দের অশ্রুত্যাগ। তোমাদেরকে অবলম্বন করেই আমাদের এই পথ চলা। তোমাদের সম্মান-সৌজন্যেই আমাদের এত কিছু করা। যদি আমরা এইটুকু না করতাম, তবে অবশ্যই তোমাদের আত্মা কষ্ট পেত। তোমাদের সবার প্রতি রইল আমাদের ভক্তিপ্লুত সালাম।

অত:পর আমাদের জন্য দ্বিতীয় শুভ সংবাদটি হলো এই যে, এ বৎসরই জামাতের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়া আহমদীয়া হতে সর্ব প্রথম এক ব্যাচ (৮জন) ছাত্র মোবাশ্বের মুরব্বী শিক্ষা কোর্স শেষ করে স্বল্প সময়ের মধ্যেই তারা জামাতের সেবায় আত্ম নিয়োগ করতে যাচ্ছে, ইনশাআল্লাহ্।

এটাও আমাদের জন্য আরো একটি পরম সুখের সংবাদ, আশার সংবাদ। আমাদের প্রাণান্ত-চেষ্টার গৌরবোজ্জ্বল ফসল। এরজন্য আমাদের আধ্যাত্মিক প্রিয় নেতা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর দোয়া ও অবদানকে অবনত শিরে স্বীকার করি, যাঁর উদ্দীপনা ও অবদানের কল্যাণে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সাথে মহান আল্লাহ্‌র অপার অসীম কৃপাকেও স্মরণ করি, যিনি এ অধমগণের দুর্বলতায় শক্তি ও সাহস দিয়ে এতবড় একটা প্রতিষ্ঠান চালানোর ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের কাজে তৌফিক দান করেছেন।

আমরা সেসব পিতা মাতার জন্য হৃদয় উজাড় করে দোয়া করব, যারা জামাতের স্বার্থে ও খিলাফতের ভালবাসায় তাদের প্রিয় সন্তানদেরকে এ পথে অকাতরে উৎসর্গ করেছেন। আমরা একান্ত আশাবাদী যে, জামেয়ার আলোয় আলোকিত এসব শিক্ষার্থী প্রত্যন্ত অঞ্চলের জামাতগুলিতে গিয়ে ইসলামের প্রভুত-কল্যাণ সাধন করবে।

তৃতীয় শুভ সংবাদটি হলো, আমাদের জুবিলী বৎসরের ৭ সেপ্টেম্বর শুক্রবার হতে জামাতে

আহমদীয়া বাংলাদেশ মাদ্রাসাতুল হিফজুল কুরআন কোর্স শুরু করেছে, আলহামদুলিল্লাহ্। ইহা আমাদের জন্য আরো একটি মহানন্দ ও পরম আশাপ্রদ সংবাদ। পরম করুণাময় খোদা তাআলার দরবারে আমরা অসীম অনন্ত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এই কারণে যে, তিনি আমাদের মত এহেন নগন্যদেরকে এমনি ধরণের মহান একটি কর্মকান্ড হাতে নেয়ার তৌফিক দান করেছেন। আলহাম্‌দুলিল্লাহ্।

হুযূর আনোয়ার (আই.) ও আমাদের এ কাজের সার্বিক সফলতার জন্য দোয়া করেছেন, আমরা তাঁর সমীপে শত হাজার শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। যেসব মাতা-পিতা এ কর্মসূচীতে তাদের সন্তানদেরকে উৎসর্গ করেছেন, আমরা তাদের কাছে শ্রদ্ধাভরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং সবাই মিলে দোয়া করছি, মহান খোদা তাদের হৃদয়ের আশা ও মনোবাঞ্ছাকে শতভাগ পূরণ করুন।

জামাতের সকল স্তরের আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নীগণের নিকট একান্ত দোয়ার আরজ করছি, আপনারা সবাই অহোরাত্র দোয়া করুন এবং অশ্রুঝরা নেত্রে দোয়া করুন, যেন খোদা তাআলা আমাদের এসব প্রচেষ্টাকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং তাতে সার্বিক সফলতা দান করেন। কারণ, রহমান খোদার রহম ও ফজল ছাড়া আমাদের প্রচেষ্টায় কোন কাজই সমাপ্ত করা সম্ভব নয়।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠা শতবার্ষিকী জুবিলী উপলক্ষে প্রকাশিতব্য স্মরণিকার জন্য লেখার আহবান

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ পূর্তি উদযাপনের অংশ হিসেবে প্রকাশিতব্য স্মরণিকায় প্রকাশের জন্য জামা'তের সকল ভাই-বোনের কাছ থেকে লেখা আহবান করা যাচ্ছে।

বিষয়সমূহ:

ক) **তবলীগের ক্ষেত্রে বিশেষ অভিজ্ঞতা**
খ) **ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলী**
গ) **আল্লাহ্ ও রসুল (সা.)-এর শান**
ঘ) **আহমদীয়াত গ্রহণের কারণে যে ত্যাগ বা মূল্য দিতে হয়েছে**
ঙ) **দোয়া কবুলিয়তের ঘটনা**
চ) **জামা'তের অতীত ইতিহাস, ঐতিহ্য কিংবা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা** ইত্যাদি

লেখার নিয়মাবলী: লেখাটি হতে হবে তথ্যবহুল ও প্রাঞ্জল। লেখা যেন খুব দীর্ঘ না হয়। লেখাটি অবশ্যই কম্পোজ করে ও বিষয়বস্তুর সাথে কোন ছবি থাকলে ছবির স্ক্যানসহ CD তৈরী করে ডাকযোগে পাঠাতে হবে। অথবা E-mail-এ Soft কপি পাঠানো যাবে। লেখার বিষয়সমূহ ও ঘটনাবলী অতিরঞ্জন মুক্ত ও বস্তুনিষ্ঠ-সঠিক হতে হবে। স্থানীয় জামা'তের আমীর/প্রেসিডেন্ট কর্তৃক সত্যায়নকৃত থাকতে হবে। অনির্বাচিত লেখার কোন অনুলিপি ফেরত দেওয়া হবে না। লেখা নির্বাচনের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত।

লেখা অবশ্যই আগামী ১৫ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় অথবা E-mail address-**এ লেখকের ছবি ও পরিচিতি সহ পৌঁছাতে হবে:**

প্রযত্নে: মুহাম্মাদ নুরুল ইসলাম মিঠু
ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশায়াত
ও সদস্য সচিব, শতবার্ষিকী জুবিলী প্রকাশনা সাব-কমিটি
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

E-mail: amjb100@gmail.com

সুধি দর্শক-শ্রোতা! আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন, দর্শকদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে সরাসরি সম্প্রচারিত আলোড়ন সৃষ্টিকারী জনপ্রিয় ধর্মীয় প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান 'সত্যের সন্ধানে' (১৯তম পর্ব) এমটিএ লন্ডন স্টুডিও থেকে আবারো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, ইনশাআল্লাহ্। আসছে ২৯ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত টানা ৪ দিন এই অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারিত হবে।

অনুগ্রহ করে সারা বিশ্বের বাংলাভাষী সকল আহমদী ভাই-বোনদেরকে এই সাড়াজাগানো জ্ঞানগর্ভ অনুষ্ঠানটি পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এবং সহকর্মী মেহমানদের নিয়ে দেখার, সরাসরি অংশগ্রহণ করার এবং এর সার্বিক সফলতার জন্য দোয়া করার অনুরোধ করা যাচ্ছে। এছাড়া আপনাদের বিশেষভাবে অনুরোধ করছি, তবলীগে আশারা পালনকলীন সময়ে যে সকল মেহমানদের সাথে আপনারা ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও সু-সম্পর্ক স্থাপন করেছেন তাদেরকেও এ অনুষ্ঠানে নিয়ে আসবেন।

দিন ও তারিখ	বাংলাদেশ সময়	জিএমটি	ব্যপ্তিকাল
বৃহস্পতিবার ২৯/১১/২০১২	রাত ৮ থেকে	১৪.০০	২ ঘন্টা
শুক্রবার ৩০/১১/২০১২	রাত ৮ থেকে	১৪.০০	২ ঘন্টা
শনিবার ০১/১২/২০১২	রাত ৮ থেকে	১৪.০০	২ ঘন্টা
রবিবার ০২/১২/২০১২	রাত ৮ থেকে	১৪.০০	২ ঘন্টা

আপনার প্রশ্ন পাঠানোর জন্য যোগাযোগ করুন ঃ

টেলিফোন ঃ ০০-৪৪-২০৮-৬৮৭-৮০১০

ফ্যাক্স ঃ ০০-৪৪-২০৮-৬৮৭-৮০৩৭

ই-মেইল ঃ sslive@mta.tv

অনুষ্ঠানটি সরাসরি দেখার জন্য লগ-ইন করুন ঃ

www.mta.tv

পত্র-পত্রিকার পাতা থেকে

প্রথম আলো

ঢাকা, সোমবার, ১২ নভেম্বর ২০১২, ২৮ কার্তিক ১৪১৯, ২৬ জিলহজ ১৪৩৩

http://www.prothom-alo.com/detail/date/2012-11-12/news/304636

আক্রমণের পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে হবে

আহমদিয়া জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা

বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময় আহমদিয়া জনগোষ্ঠীর ওপর অত্যাচার-নির্যাতনের ঘটনাগুলো দেশে-বিদেশে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের সমালোচনার শিকার হতে হয়েছিল বাংলাদেশকে। আহমদিয়া জনগোষ্ঠীর ওপর পরিকল্পিত ওই সব আক্রমণের, বিশেষত তাদের মসজিদে হামলার পেছনে তৎকালীন ক্ষমতাসীন মহলের একটি অংশের ইন্ধনের অভিযোগ ছিল। বলা হয়, এ কারণেই সরকারি আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থা আহমদিয়াদের প্রার্থনালয় ও আবাসগৃহের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারেনি।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে গত প্রায় ছয় বছর আহমদিয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি। কিন্তু ৭ নভেম্বর রংপুরের মেনানগরের বানিয়াপাড়ায় আহমদিয়া জনগোষ্ঠীর একটি পুনর্নির্মাণাধীন মসজিদ কিছু লোক ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে; লোকজনের ওপর হামলা করেছে, তাদের বাড়িঘরে ভাঙচুর ও লুটপাট চালিয়েছে। অভিযোগ করা হয়েছে, এসব হামলা ও ভাঙচুরের সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন। এ ঘটনা তাই বেশ উদ্বেগের, কেননা পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ সত্য হলে আহমদিয়াদের ওপর এই হামলা-ভাঙচুরের ঘটনাকে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলের পুনরাবৃত্তি হিসেবে ধরে নিতে হচ্ছে।

শনিবার রাজধানীর বকশিবাজারে আহমদিয়া মুসলিম জামাতের নেতারা সংবাদ সম্মেলন ডেকে রংপুরের মেনানগরের আহমদিয়া সদস্যদের জানমালের নিরাপত্তা দিতে সরকার ও প্রশাসনের সহায়তা চেয়েছেন। নির্বিঘ্নে নিজেদের ধর্ম পালনের জন্যও তাঁরা সরকার-প্রশাসনের সহযোগিতার প্রয়োজন অনুভব করছেন। এমন অবস্থা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না যেখানে একটি জনগোষ্ঠীর মানুষ স্বাধীনভাবে ও নিরাপদে নিজেদের ধর্ম পালন করতে পারবেন না, সে জন্য সরকারের কাছে তাঁদের নিরাপত্তা-সহযোগিতা চাইতে হবে।

আহমদিয়াদের ওপর আক্রমণের পুনরাবৃত্তি অবশ্যই ঠেকাতে হবে। সে জন্য মেনানগরের আক্রমণকারীদের কঠোর শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন।

NEW AGE | Online Edition
THE OUTSPOKEN DAILY

Sunday, 11th November, 2012

http://www.newagebd.com/detail.php?date=2012-11-11&nid=29745#.UJ9EveS6dy0

Local admin inactive during Taraganj incident: Ahmadiyya leaders

Staff Correspondent

Ahmadiyya Muslim Jamaat leaders on Saturday alleged that taking advantage of the failure of the local administration to take timely action miscreants attacked their members, burnt houses and demolished a mosque at Menanagar, a village in Taraganj in Rangpur.

They alleged that the administration took no action against the offenders though it was informed repeatedly. They said Jamaat activists perpetrated the attacks to destroy social harmony in the country. They made the allegations at a news conference at the central office the Ahmadiyya community at Bakshi Bazaar. Ahmadiyya Jamaat naib national ameer Meer Mobashsher Ali and national ameer Mobasherur Rahman spoke at the news conference.

Dhaka University professor Syed Anwar Hossain, writer Shahriar Kabir and BRAC director of human rights and legal aid service Faustina Pereira also spoke.

Meer Mobashsher Ali in his written statement requested the government to immediately rebuild the Ahmadiyya mosque at Menanagar to protect the constitutionally guaranteed rights of the Ahmadiyyas. He also demanded security of life and property of Ahmadiyyas at Menanagar and their right to follow their faith without any obstruction.

Mobashsher also urged the government to identify and penalize the masterminds behind the incident. Newspapers reported on Wednesday that an Islamist group burnt an under construction tin-shed mosque of the Ahmadiyyas and two houses of the community after the administration took the move to hold a peace meeting at Menanagar.

At least 15 persons, including policemen, students and journalists, were injured after the police stopped a group of attackers at Kisamat Menanagar.

Mobasherur said though it was informed repeatedly, the local administration failed to take prompt action against the attackers.'We contacted the local police station, upazila office, but they took no timely action. The police station recorded our general diary only after we had informed the matter to the higher authorities,' he said. Mobasherur said some jamaat leaders were found to have some links with the incident. Anwar Hossain said the government had completely failed to discharge its constitutional responsibility at the trouble spot. The administration remained 'inactive' during the incidents at Taraganj in Rangpur and Ramu, he said.

সংবাদ

মজলিস আনসারুল্লাহ্ ক্রোড়ার ১৩তম স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা ২০১২ অনুষ্ঠিত

গত ৪ ও ৫ অক্টোবর রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার দু'দিন ব্যাপী ক্রোড়া মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র উদ্যোগে ১৩তম স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। ৪ অক্টোবর বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি ও প্রধান অতিথি জনাব খন্দকার সাঈদ আহমদ। কুরআন তেলাওয়াত, নযম, আহাদ পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অত:পর বক্তৃতা প্রদান করেন বিশেষ অতিথি জনাব মকবুল আহমদ, জেলা নাযেম ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ইজতেমা কমিটির চেয়ারম্যান শরীফ আহমদ ভূইয়া এবং স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট।

৫ অক্টোবর রোজ শুক্রবার সকাল ৮.৩০ মিনিট থেকে ১২টা পর্যন্ত বিভিন্ন প্রতিযোগিতা পর্ব চলে। অত:পর বাদ জুম্মা পুরস্কার বিতরণ ও সমাপ্তি অধিবেশন হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামাতের যয়ীম জনাব শরীফ আহমদ চৌধুরী। কুরআন তেলাওয়াত করেন ১ম স্থান অধিকারী জনাব তছলিম আহমদ। নযম পাঠ করেন তৌফিক আহমদ ভূইয়া। অত:পর জেলা নাযেম প্রধান অতিথি ও সভাপতির বক্তৃতার পর বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ, আহাদ পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত অধিবেশনে মোট ৬৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

শরীফ আহমদ চৌধুরী

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

মোকাররম আমীর/প্রেসিডেন্ট/মুরুব্বী/মোয়াল্লেম সাহেব

বিষয় : ২০১২ সনের ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা আদায় ও ২০শে ডিসেম্বরের মধ্যে রিপোর্ট প্রেরণ প্রসঙ্গে চলমান ঐতিহ্য অনুসারে প্রতি বছর ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদা সম্পূর্ণ আদায় করা ও হুযূর (আই.) এর নিকট আদায়কারীগণের তালিকাসহ বাৎসরিক রিপোর্ট প্রেরণ করার জন্য চলে আসছে বর্তমানেও তা বজায় থাকবে ইনশাআল্লাহ্। সুতরাং আপনাদের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন, আগামী ২০শে ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পূর্ণ চাঁদা আদায়কারীগণের তালিকা ন্যাশনাল আমীর সাহেবের দপ্তরে প্রেরণ করবেন, যাতে যথাসময়ে হুযূর (আই.) নিকট বাৎসরিক রিপোর্ট প্রেরণ করা যায়।

বছরের শুরুতে আপনার জামাতে ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা পরিমাণ এবং চাঁদা দাতাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য পত্র দেয়া হয়েছিল। সকলে অবগত আছেন যে, এ বৎসর (২০১২ সাল) কেন্দ্র হতে বাংলাদেশের জন্য ওয়াক্‌ফে জাদীদের অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ২০,০০০ এর টার্গেট দেয়া হয়েছে। আশা করি অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ও চাঁদা আদায় যাতে বেশী হয় সে ব্যাপারে চেষ্টা চালাবেন। এ ব্যাপারে স্থানীয় মুরব্বী ও মোয়াল্লেমগণের সহযোগিতা ও পরামর্শ নিবেন এবং টার্গেট পুরণ করার মাধ্যমে আমরা যাতে হুযূর (আই.) দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি সে জন্য সকলেই চেষ্টা করবেন ও বিশেষভাবে দোয়া করবেন।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সকলকে আর্থিক কুরবানীতে সামিল হওয়ার তৌফিক দিন। আমীন।

শহীদুল ইসলাম
সেক্রেটারী ওয়াক্‌ফে জাদীদ
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

বিজ্ঞপ্তি

তালীম দফতর হতে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

তালীম দফতর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ এর পক্ষ থেকে জানাচ্ছি যে, হুযূর (আই.)-এর অনুমোদনক্রমে এ বছর শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে সর্বশেষ (২০১২ সালে) ঘোষিত ভাল ফলাফল অর্জনকারী ছাত্র/ছাত্রীদেরকে আগামী ২০১৩ সালে অনুষ্ঠিতব্য আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সালানা জলসায় পুরস্কার প্রদান করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

এই উপলক্ষ্যে সকল স্থানীয় জামা'তের আমীর/প্রেসিডেন্ট/মুরুব্বী মোয়াল্লেম সাহেবানগনের নিকট সার্কুলার ও ফরম প্রেরণ করা হয়েছে। আপনার সন্তান যদি এ পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য হয়, তাহলে স্থানীয় আমীর/প্রেসিডেন্ট সাহেবের সাথে যোগাযোগ করে আগামী ১৫ জানুয়ারী ২০১৩ এর মধ্যে তথ্য কেন্দ্রে পৌঁছানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত তারিখের পর কোন আবেদন কেন্দ্রে প্রেরণ করা হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হবে না।

জামালউদ্দিন আহমদ
সেক্রেটারী তালীম
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

তারুয়া মজলিসে ১৩তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ০২/১১/২০১২ রোজ শুক্রবার বাদ ফজর হতে বিকাল ৫ ঘটিকা পর্যন্ত মজলিস আনসারুল্লাহ্ তারুয়ার উদ্যোগে ১৩তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন রিজওনাল নাযেম জনাব মোশারফ হোসেন। এতে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে মকবুল আহমদ, জেলা নাযেম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া রিজিওন, হাবিবউল্লাহ্ রিজিওনাল তালীমুল কুরআন, স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব সামছু মিয়া।

ইজতেমায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতা হয় যেমন কুরআন তেলাওয়াত, নযম (বাংলা ও উর্দু) বক্তৃতা দ্বীনিমালুমাত পরীক্ষা, কুইজ, স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা এবং খেলাধূলা। তারপর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শুরু হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন রিজিওনাল নাযেম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও সমাপনী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জহির আহমদ মিয়াজী, জনাব মকবুল আহমদ জেলা নাযেম, জনাব হাবীবউল্লাহ নাযেম তালিমুল কুরআন। এরপর সভাপতির নসিহতমূলক বক্তব্য, আহাদ পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়।

খলিল আহমদ

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকার দপ্তরে জরুরী ভিত্তিতে একজন গাড়ীচালক প্রয়োজন। ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী অভিজ্ঞ আহমদী গাড়ীচালকদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান কারা যাচ্ছে। আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকার বরাবর লিখিত দরখাস্ত স্থানীয় জামাতের আমীর/প্রেসিডেন্টের সুপারিশসহ আগামী ৩০ নভেম্বর তারিখের মধ্যে ঢাকা জামাতের দপ্তরে পৌঁছতে হবে। বেতন অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে আলোচনা সাপেক্ষ।

বশির উদ্দিন আহমদ
জেনারেল সেক্রেটারী
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী

১. প্রত্যেক মাসে একটি নফল রোযা রাখুন। এজন্যে প্রত্যেক জামাতে স্থানীয়ভাবে মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন নির্ধারিত করে নিন।

২. প্রত্যেকদিন দু' রাকাআত নফল নামায (ইশার পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত অথবা যুহরের নামাজের পর) আদায় করুন।

৩. সূরা ফাতিহা কমপক্ষে প্রত্যহ সাতবার পাঠ করুন।

৪. রাব্বানা আফ্‌রিগ আলাইনা সাব্‌রাওঁ ওয়াসাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন [সূরা বাকারা ঃ ২৫১] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫. রাব্বানা লা তুযিগ ক্বুলূবানা বা'দা ইয্‌ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্‌'হাব [সূরা আলে ইমরান– ৯] প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমিই মহান দাতা।

৬. আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম [আবূ দাউদ ঃ কিতাবুস সালাত] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা [অবিশ্বাসীদের মোকাবেলায়] তোমাকে তাদের অন্তরে [ঢালস্বরূপ] রাখছি আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৭. আস্‌তাগফিরুল্লাহা রব্বি মিন কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়াআতুবু ইলায়হে। প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ আমি আমার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহতাআলার নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তারই সমীপে প্রত্যাবর্তন করি।

৮. সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মদ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর প্রশংসাসহ অতি পবিত্র। তিনি অতি পবিত্র অতি মহান। হে আল্লাহ্‌! মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

৯. দুরূদ শরীফ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

হুযূর (আইঃ)-এর এই আহ্বান বাস্তবায়ন করার জন্য স্থানীয় জামাত ও জামাতের সমস্ত অঙ্গ সংগঠনকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকি জুবিলী ২০১৩ ন্যাশনাল কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

بسم الله الرحمن الرحيم

এমটিএ, বাংলাদেশ স্টুডিও

নভেম্বর ২০১২, এমটিএ বাংলা অনুষ্ঠানের সম্ভব্য অনুষ্ঠানসূচী (প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭ টার পর)

তারিখ	বিষয়বস্তু
০৩/১১/১২, শনি URDV 545 (পুণঃ)	বক্তৃতাঃ "আদর্শ সমাজ গঠনে নারীর ভূমিকা ও দায়িত্ব" - মোহাম্মদ হাবীবুল্লাহ। শিশুদের অনুষ্ঠানঃ এসো গল্প শুনি , পরিচালনায়ঃ সৈয়দা আমাতুর রশিদ ।
০৫/১১/১২, সোম URDV 546 (পুণঃ)	তবলীগি অনুষ্ঠান , তেজগাওঃ আলোচক - মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী । বক্তৃতাঃ "আহমদীয়া খিলাফতের অবদান ও বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার" - প্রফেসর ডঃ তারিক সাইফুল ইসলাম।
০৬/১১/১২, মঙ্গল URDV 547 (পুণঃ)	"স্মৃতি কথা" - মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, উপস্থাপনায়ঃ আহমদ তবশির চৌধুরী ।
০৭/১১/১২, বুধ URDV 548 (পুণঃ)	"স্মৃতি কথা" - আলহাজ্ব মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক, উপস্থাপনায়ঃ আহমদ তবশির চৌধুরী ।
১০/১১/২০১২,শনি **URDV 551 (নতুন)**	**বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠানঃ "বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় যুগ খলিফার দিক নির্দেশনা" — অংশ গ্রহণেঃ মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী ও আহমদ তবশির চৌধুরী**
১২/১১/২০১২,সোম **URDV 552 (নতুন)**	গাহরে শাহু, লাহোরের আহমদীয়া মসজিদে জঙ্গী হামলার চাক্ষুশ স্বাক্ষী - আব্দুল মুসাব্বির ওয়াকার, সাক্ষাতকার গ্রহণেঃ মাওলানা বশিরুর রহমান।
১৩/১১/২০১২,মঙ্গল **URDV 553 (নতুন)**	পুস্তক আলোচনাঃ "হায়াতে তাইয়েবা" পর্ব - ২, মাওলানা জাফর আহমদ ও মাহমুদ আহমদ সুমন; বক্তৃতাঃ "নারী ও শিশুদের সাথে মহানবীর (সাঃ) আচরন কিরূপ ছিল ?" - প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী
১৪/১১/২০১২,বুধ **URDV 554 (নতুন)**	খুলনা বিভাগের কয়েকজন ত্যাগী লাজনা সদস্যার সাক্ষাতকার, পর্ব -১; শিশুদের অনুষ্ঠানঃ এসো গল্প শুনি, নযম - জনাব আব্দুল ওয়াহেদ, চট্টগ্রাম।
১৭/১১/১২, শনি **URDV 551 (পুণঃ)**	**বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠানঃ "বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় যুগ খলিফার দিক নির্দেশনা" — অংশ গ্রহণেঃ মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী ও আহমদ তবশির চৌধুরী**
১৯/১১/১২, সোম **URDV 555 (নতুন)**	লন্ডন প্রবাসী প্রবীন বাংলাদেশী আহমদী শরাফত আলী সাহেবের সাক্ষাতকার, সাক্ষাতকার গ্রহণেঃ মোহাম্মদ আব্দুল হাদী; বক্তৃতাঃ "আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তি সমূহের খন্ডন" - আলহাজ্ব মাওলানা সালেহ আহমদ।
২০/১১/১২, মঙ্গল **URDV 551 (পুণঃ)**	**বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠানঃ "বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় যুগ খলিফার দিক নির্দেশনা" — অংশ গ্রহণেঃ মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী ও আহমদ তবশির চৌধুরী**
২১/১১/১২, বুধ URDV 552 (পুণঃ)	গাহরে শাহু, লাহোরের আহমদীয়া মসজিদে জঙ্গী হামলার চাক্ষুশ স্বাক্ষী - আব্দুল মুসাব্বির ওয়াকার, সাক্ষাতকার গ্রহণেঃ মাওলানা বশিরুর রহমান।
২০/১১/১২ থেকে ২৮/১১/১২ বৃহস্পতি থেকে বুধ	"সত্যের সন্ধানে" ১৮তম পর্বের পুণঃপ্রচার (৭ দিন)
২৯/১১/১২ থেকে ০২/১২/১২	**"সত্যের সন্ধানে" ১৯ তম পর্ব (নতুন) ৪ দিন**

- *প্রতি শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭ টায় (শীতকালীন সময় অনুযায়ী)- লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে যুগ খলিফার জুমুয়ার খুতবার সরাসরি সম্প্রচার এবং খুতবার পর কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্কের অনুষ্ঠান,*
- *প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭ টায় — পূর্ববর্তী জুমুয়ার খুতবার পুণঃপ্রচার*
- *প্রতি রবিবার সন্ধ্যা ৭ টায় — কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্কের অনুষ্ঠান ।*

নিয়মিত এমটিএ দেখুন, নিজের ও পরিবারের হেফাজত করুন

প্রচারেঃ এমটিএ বাংলাদেশ স্টুডিও
যোগাযোগঃ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪, বকশি বাজার রোড, ঢাকা - ১২১১
Email: atabshir@hotmail.com Web: www.mta.tv; www.ahmadiyyabangla.org; www.alislam.org

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে বয়'আত গ্রহণের ৫ম ও ৬ষ্ঠ শর্তাবলী

বয়'আত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করবে

৫। সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তাআলার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থায় তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তাঁর পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে এবং সকল অবস্থায় তাঁর ফয়সালা মেনে নিবে। কোন বিপদ উপস্থিত হলে পশ্চাদপদ হবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হবে।

৬। সামাজিক কদাচার পরিহার করবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে।

সৌজন্যে :

ডিলার- জনতা সেনেটারী
হাজী পাড়া, রামপুরা, ঢাকা

গাজী
গুণে মানে সেরা
পানির পাম্প ব্যবহার করুন

New Vol. No. 75 | 9th Issue

The Ahmadi

Fortnightly

15th November, 2012 | Tk. 15.00

Regd. No. D. A.-12

সেই
১৯৮৮
সাল থেকে

ধানসিড়ি রেস্তোরাঁ

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
নীচ তলা
রোড নং ৪৫, প্লট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩,
০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

ধানসিড়ি খাবার
অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)
(রাপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

"এছাড়া আমাদের আর কোথাও কোন শাখা নেই"
মান এবং পরিমাণের নিশ্চয়তায় ধানসিড়ি রেস্তোরা-১, ধানসিড়ি রান্না আপনার ঘরের রান্না

cta

CTA International Ltd.

CTA is your one-stop business entry point for outsourcing, sourcing and general business services in China & Bangladesh. A reliable business partner with the required technical & organizational expertise you need for successful business.

Ch. Tahir Ahmad
No.404, Building 02, Kebei Garden, Keqiao,
Shaoxing, Zhejiang, P.R.China
Telephone: +86-137-77323879
Fax: +86-575-84817780
E-Mail: ctahkg@gmail.com

House No.26, 2nd Floor, A2 & B2, Road # 02, Block-B,
Niketon Housing Society, Gulshan-01, Dhaka
Bangladesh.
Telephone: +880-1714-069952
E-Mail: contact.puma@gmail.com

Printed and Published by **Muhammad Nurul Islam Mithu** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com